একক ৯ ❑ ভারত সম্বন্ধে পূর্ব মনোভাব

গঠন

৯.০ প্রস্তাবনা
৯.১ প্রাচ্যবিদ্যা
৯.২ ইভানজেলিকালিজম
৯.৩ উপযোগিতাবাদ
৯.৪ উদারনীতি
৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি
৯.৬ অনুশীলনী

৯.০ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং ঊনিশ শতকের প্রথমে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং চরিত্র ব্রিটিশদের চোখে এক অভূতপূর্ব বিষয় ছিল। ১৮৩৩ সালে কোম্পানির সনদ পুনরায় নবীকরণ করার সময় থমাস ম্যাকলে তাঁর ভাষণে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন যে ভারতীয় সাম্রাজ্য হচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার একটা অদ্ভুত অবস্থা যার নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না। ভারতের প্রতিটি প্রান্তরে নিজেদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটানোর সময় ব্রিটিশশাসকেরা এই সুদূর প্রসারিত নির্ভরশীলতাকে কিভাবে পরিচালন করবে এবং সবথেকে গু(ত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণরেখাকে নিজেদের কাছে ব্যাখ্যা করবে, সেই অসুবিধাগুলোর সম্মুখীন হয়েছিল তারা। ইংরেজী সভ্যতার বিশিষ্ট দিকগুলোকে রূপায়িত করার (ে ত্রে ভারত কোন কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেনি। বিভিন্নভাবেই এটা একটা অসুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, একটা চুম্বকশক্তি(যার পরিধা ব্রিটেনের বিশাল বাণিজ্যিক শক্তি(র স্বাভাবিক বিকাশের পথকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এটা অসামাজিক যুগের একটা সামরিক সাম্রাজ্য যার বিশাল দায়িত্ব ইংরেজ শিল্পের বাণিজ্যিক মূল্যের দ্বারা দ্বৈতভাবে ভারসাম্যতা বজায় রাখত, পুরো ঊনিশ শতক অধিগ্রহণ করে রেখেছিল ব্রিটিশ শাসকদের বৈদেশিক নীতি যা রাশিয়ার সঙ্গে এক নকল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

পটভূমি ঃ

তাই, ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের শাসক হিসেবে নিজেদের জন্য যত জমি তৈরী করার চেষ্টা করল ততই তারা এ দেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নতুন এবং ব্যতিত্র(মী তত্ত্বর উদ্ভাবন করতে শু(করল। জাতীয়তাবাদী মতামতের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ সংজ্ঞানুসারে নিজেদের সমাজের মতো পরিচালনা করতে গিয়ে কাজটা তাদের কাছে আরও কঠিন হয়ে পড়ল। গ্রেট ব্রিটেনের সংযুক্ত(রাজ্য তার স্বভাব অনুযায়ী কখনই সংঘবদ্ধ হতে পারেনি 'Imagined Community' বা 'কল্পিত গোষ্ঠী' ভুক্ত(অদূরবর্তী ভারতবর্ষের মানুষদের সঙ্গে। প্রকৃতপ(ে , যাই হোক না কেন, ব্রিটিশ জাতীয়ভুক্ত(সম্প্রদায়ের বি(্বাসপূর্ণ ইঙ্গিত ছিল যে ভারতের মানুষরাও একইভাবে তাদের নিজেদের জাতিসত্তা গড়ে তুলতে স(ম হবে। আবার, ঊনিশ শতকে দেখা যায় যে ব্রিটেনের সমাজব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে এক উদারনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক

কাঠামোয় যা ভারতের অবস্থানরত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে এক বিপরীতমুখী স্রোতের মুখে ফেলেছিল যার ফলে ব্রিটিশ সংবিধানে খুব গভীরভাবে অনুমান করা হয়েছিল যে ভারতের জনগণের এবং প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে তাদের শাসককে বেছে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে।

৯.১ প্রাচ্য বিদ্যা

১৭৭২-১৮৩৫ সালের ব্রিটিশ প্রাচ্যরীতি বা স্বৈরশাসন ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা যা ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীকে ভারতের সংস্কৃতি ও ভাষা জানানোর জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর (মতায় আসীন হওয়া থেকেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এই পর্যায় শু(হল।

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্‌রা এক অনন্য গোষ্ঠী ছিলেন যাঁরা যুক্তি(, ঐতিহ্য ও বি(েজনীনতার আদর্শে পুরো অষ্টাদশ শতককে আলোকিত করে রেখেছিলেন বেশিরভাগ (ে ত্রে। পরবর্তী সময়ে ভারতে কর্মরত অন্যান্য ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের থেকে একেবারেই আলাদা ছিলেন এই প্রাচ্যবিদ্‌রা যারা প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় রীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গু(ত্ব সহকারে সম্মান করতেন। ভারতীয় ভাষাবিদ্যা, প্রত্নবিদ্যা এবং ইতিহাসের বিভিন্ন (ে ত্রে তাঁরা বিশেষ অবদান রেখে গেছিলেন। ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচ্যবিদ্যা এবং পশ্চিমী যুক্তি(বাদকে একত্রিত করার ধারণা অনুপ্রাণিত হয়েছিল ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যা দ্বারা। বৌদ্ধিক দিক থেকে এই ধারণা ঊনিশ শতকের ভারতবর্ষে এক শক্তি(শালী চিন্তার প্রতিফলন। মেটকাফের মতানুসারে এই বিদ্যার বিস্তীর্ণ পদ্ধতি কিছু প্রাচীন বি(্বাসগুলোকে প্র(্নের সম্মুখে এনে ফেলে। এদের মধ্যে 'প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র'-এর ধারণাটাই পরিব্যাপক ছিল। এই ধারণা খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুধাবন করা গেছিল যে কোন ইচ্ছা এবং তদানুসারে কোন আইন স্বৈরশাসকদেরও ছেড়ে দিত না। ১৭৭০ সালে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস হিন্দুদের সম্পর্কে বিস্তৃত মতামত দেন যে অপরিবর্তিত প্রাচীন আইন এই সম্প্রদায়ের মানুষদের নিজেদের আয়ত্বে রেখেছিল। তিনি এও জোরের সঙ্গে বলেন যে দেশের 'প্রাচীন সংবিধান' ভীষণভাবে অ(ত ছিল। ১৭৮৪ সালে, ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয়েছিল 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' যার প্রথম সভাপতি ছিলেন উইলিয়াম জোনস্ এবং আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের গবেষণাধর্মী কাজের মাধ্যমে পন্ডিতসুলভ কৌতুহল এবং প্রশাসনিক সুবিধাগুলোর সংমিশ্রণের তথ্যগুলো জানতে পারা যায়। এই পথ অনুসরণ করেই গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলির দ্বারা কলকাতায় স্থাপিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, একটা শি(ামূলক কেন্দ্র সেখানে কোম্পানীর কর্মচারীদের এই (ে ত্রে নিয়োগ করার আগে শি(ানবীশ থাকতে হত। এই কলেজের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ঠিকমত বোঝা যাতে ভারতবর্ষের শাসন পদ্ধতিকে ঠিকমত পরিচালনা করা যায়। শেষপর্যন্ত, ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যার সফলতাই তাদের ধ্বংসের অন্যতম উৎস, যেহেতু ভারতের প্রাচীন বিদ্যাগুলো অনুধাবন করা হয়ে গেছিল, খ্রীশ্চান মিশনারী এবং আরো ঔপনিবেশিক শাসনকর্তারা বুঝে উঠতে পারছিলো না যে শাসক না শোষক, কাদের জন্য এই প্রাচ্যবিদ্যা গঠিত। ১৮১৩ সালের সনদ আইন এক নতুন ইউরোপীয় গোষ্ঠীদের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এই খ্রীশ্চান ইভানজেলিকালরা খুব তাড়াতাড়ি সারা বাংলায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল। নতুন প্রজন্মের 'উত্তর-প্রাচ্যবাদী'র মিশনারীরা ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদীদের থেকে একেবারেই বিপরীত ছিল। তারা হিন্দু সংস্কৃতিকে অপবিত্র এবং অনগ্রসর সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করত। তাদের কাছে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মূল শক্তি(নিহিত ছিল খ্রীশ্চান প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর। তাদের ল(্য ছিল হিন্দু সংস্কৃতিকে যতটা সম্ভব মুছে ফেলা এবং তার পরিবর্তে খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধ, ইংরেজী শি(া এবং পশ্চিমী ধারণাগুলোকে আরোপ করা।

৯.২ ইভানজেলিকালিজম

ভারতের ইউরোপীয় সমাজে ইভানজেলিকাল বা ভগবদ্‌সংত্র(ান্ত প্রভাব আদর্শগত দিক থেকে কতটা বিস্তার করেছিল তা বলা খুব কঠিন এবং এটা যতখানি না স্থানীয় সফলতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তার থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল ইংল্যান্ডের সমাজে ইভানজেলিকার বা ভগবদসংত্র(ান্ত মতবাদের বিস্তীর্ণ প্রভাবের দ্বারা। বস্তুতঃ, ভারতের মাটিতে একটা শক্ত(জমি তৈরী করার পর, খ্রীশ্চান ধর্মান্তরীদের জন্য নৈতিক র(া, 'সতী', 'শিশুহত্যা'র মত কিছু অমানবিক আচার রোধ করা এবং মন্দির ও হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে ব্রিটিশ সমর্থন তুলে নেওয়ার মত কিছু রাজনৈতিক কাজকর্মের ওপর এই মিশনারীরা সরাসরি মতপ্রকাশ করতে আরম্ভ করল। যদি এই কর্মকান্ড শুধু একটি ক(ে পরিবেষ্টিত থাকত এইভাবে তাহলে এই ইভানজেলিকাল মতবাদের তুলনামূলকভাবে কম গু(ত্ব থাকত। ঘটনা হচ্ছে যে এটা ভারতীয় সমাজকে পুরোপুরি পরিবর্তিত করতে গিয়ে আরো শক্তি(শালী রাজনৈতিক স্রোতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে। এই মৈত্রীর উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আভাস পাওয়া যায় চার্লস গ্রান্ট স্বা(রিত একটি লেখায় যা ১৭৯৭ সালে 'কোর্ট অফ ডিরেকটার্স'দের সামনে পেশ করা হয়। তাঁর স্বা(রিত প্রস্তাবের আর্জি ছিল যে ভারতবর্ষে এই ইভানজেলিকারন মতবাদকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ব্রিটিশ শক্তি(র প্রথম কর্তব্য এবং উদ্দেশ্য হওয়াই উচিৎ। গ্রান্ট হিন্দু গ্রন্থগুলো থেকে উক্তি(তুলে এনে এবং ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত থেকে ভারত সম্বন্ধে একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলেন যে এই ভারতবর্ষ নৃশংস কুসংস্কারের স্রোতের মুখে পতিত ছিল, এই কলুষিত সমাজ সবচেয়ে দুশ্চরিত্রার স্থান এবং পৃথিবীতে সবথেকে অসৎ ও দুবৃত্ত অধিবাসীতে অধ্যুষিত এই দেশ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল যার কোন পরিমাপ নেই। উইলবারফোর্স-এর মতে হিন্দু ভক্ত(রা ছিল 'কাম, অনৈতিকতা, চাতুরতা এবং হিংসার এক একটি অতি দানব। সং(েপে, এদের ধর্মীয় প্রথা ছিল এক বৃহৎ ঘৃণ্য বস্তু।' আসলে, ইভানজেলিকালদের কাছে প্রত্যেক যুগের ইতিহাসে ভগবানের হাত দেখা গেছে, এবং ইংরেজদের (মতার অধীনে থাকা ভারতবর্ষের মত আর কোনো জায়গায় এমন স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি। ভারতের নিম্নস্তরের মানুষদের কাছে ইভানজেলিকাল মতবাদের সঙ্গে (মতা নিয়ে আসল দায়িত্ব এবং কর্তব্য। গ্রান্ট যুক্তি(দিয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে ব্রিটিশ প্রথার প্রধান নীতি হল একত্রিত করার নীতি, যা ব্রিটিশ এবং তার ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে সৃষ্ট ভয়ানক ফাঁক বন্ধ করে দেবে।

৯.৩ উপযোগিতাবাদ

দুটো অবস্থানরত সম্ভাবনা যা উজ্জীবিত করত ব্রিটিশ নীতি, এটা সহজেই অনুমেয় যে উপযোগিতাবাদ এই প্রবণতাকে একত্রিত করার জন্য সর্বাগ্রে এসেছিল এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী উৎপাদক শ্রেণী এবং মিশনারীদের মৈত্রীর দ্বারা যে সংস্কার-সাধন উদ্ভুত হয়েছিল তার ব্যুহমুখ তৈরী করেছিল এই উপযোগিতাবাদ। এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে সংস্কার-সাধনে সাধারণ স্রোতের সঙ্গে মিশে যাওয়াই ছিল উপযোগিতাবাদীদের একমাত্র ল(্য। সমস্ত সমাজ-সংস্কারকদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল দ(সরকারের সঙ্গে সস্তায় মুক্ত(বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া এবং ভারতবর্ষকে খুব তাড়াতাড়ি আধুনিকতার মোড়কে তৈরী করা। তবুও জেমস মিল এবং বেনথাম প্রণীত মতবাদ যা সমস্ত উদ্ধার মতবাদ থেকে একেবারেই আলাদা এবং স্পষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। উপযোগিতাবাদীদের এবং ইভানজেলিকালদের চিন্তাভাবনার মধ্যে বৃহত্তর অর্থে দেখতে গেলে অনেক সদৃশতা ছিল। ভারতীয় সভ্যতাকে বরদাস্ত করা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিপ(ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এই দুই মতবাদ যা ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের যুগে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। ইভানজেলিকালিজম এবং উপযোগিতাবাদ দুটোই ছিল ব্যক্তি(ত্ববাদী আন্দোলন, দুটোর ল(্যই ছিল প্রথার দাসত্ব

থেকে এবং উচ্চশ্রেণীভুক্ত(মানুষ ও পুরোহিতদের অত্যাচার থেকে ব্যক্তি(কে র(া করা। দুজনের কাছেই মানুষ ছিল অনুভূতি সম্পন্ন জীব যার মধ্যে আনন্দ এবং বেদনা দুই-ই সমানভাবে মূর্তমান। অবজ্ঞাই মানুষকে শেষপর্যন্ত সুখী হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। উপযোগিতাবাদীদের মতে সুখী হতে গেলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবহারকে আগে গু(ত্ব দিতে হবে যা একমাত্র সম্ভব জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং শি(ার প্রসার ঘটানো। কিন্তু আইনী প্রভাবের সঙ্গে তুলনা করলে এই মতবাদগুলো কিছুই নয়। মানুষের চারিত্রিক স্বভাব নির্ধারণ করার (মতা ছিল প্রথমে আইনপ্রণেতা এবং তার আদেশ, তা হচ্ছে, সরকার এবং আইন। উপযোগিতাবাদীরা তাদের পূর্বসুরীদের কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করল ভগবান সরিয়ে মানুষের হাতে 'স্বর্গীয় ন্যায়' আরোপিত করে। ভারতের অসুবিধাগুলোকে বি(ে-ষণ এবং সমাধান করতে গিয়ে মুক্ত(মতবাদ এবং ইভানজেলিকালদের থেকে উপযোগিতাবাদীদের পৃথক করে দিল এই ধারণা। মিল ভারতের পরিস্থিতিগুলোকে তিন ধারায় বিভক্ত(করলেন—সরকারের গঠন পদ্ধতি, আইনের প্রকৃতি এবং কর-এর ধরন। মিল তাঁর ভাবনাকে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বলেছেন যে এগুলোকে সংস্কার করলে পুরো ভারতীয় সমাজে এক বিপুল পরিবর্তন দেখা যাবে যা দ্রুত সভ্যতার মাপকাঠিকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। জেমসমিল এবং ইংরেজ উদারনৈতিক মতবাদের প্রধান ধারার মধ্যে পার্থক্যগুলোকে একটু গু(ত্ব অরোপ করা যায়। মিল কখনই একমত হতে পারেননি যে মূলধন বা সামগ্রীর উদ্বৃত্তই নয়া আর্থিক শিল্পের মন্দা হওয়াই একমাত্র কারণ। অথবা নতুন বাজার অর্থনীতি উদবৃত্তের নির্গমদ্বার হিসেবে একমাত্র গু(ত্বপূর্ণ দিক। 'ভারতবর্ষ, দেশের একটা বৃহৎ অনোপার্জিত বেকারীর অংশকে উপার্জন করানোর জন্য একটা (ে ত্র তৈরী করতে স(ম হবে'— এইরকম সাধারন দাবিগুলোকে মিল নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। মিল একমত ছিলেন যে মুক্ত(বাণিজ্য নীতিগতভাবে ঠিক কিন্তু একে সুখী হওয়ার একমাত্র চাবিকাঠি হওয়ায় যে জনপ্রিয় বি(্বাস তাকে অস্বীকার করেছিলেন, যা তাঁকে সবার থেকে আলাদা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বেনথ্যামের রাজনৈতিক দর্শন ছিল আসলে কর্তৃত্ববাদী যা শতাব্দী লালিত অলোকপ্রাপ্ত স্বৈরাচারিতার ফসল। এর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক (মতার প্রয়োগ করার ধারণাটা উঠে এসেছিল হবসের মতবাদ থেকে। ১৮২০ সালের মধ্যে ইংরেজ আমলাতন্ত্রকে আরও সঞ্চয়ী এবং আরো দ(হওয়ার দিকে চাপ সৃষ্টি করা হতে লাগল। বেনথ্যামের নিজস্ব হিসাব, প্রথাগত অমলাতান্ত্রিক ত্র(মোচ্চ শ্রেণীবিভাগ—এই ব্যক্তি(গত দালালির নীতির প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। শুধু তাই নয়, বেনটিঙ্ক ভারতে পৌঁছেই সাধারণ মানুষের কাছে সংস্কারের কিছু ধারণা দিতে বলেছিলেন এবং স্বভাবতই বেনথ্যাম খুবই খুশী হয়েছিলেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল যে 'যেন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে স্বর্ণযুগ আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল।'

৯.৪ উদারনীতি

বিশেষ করে পূর্বের শতকগুলিতে, ভারতবর্ষ সেই মাপকাঠির উপাদান এবং তার বিস্তৃতি ঘটিয়েছিল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে যা রাজনৈতিক এবং আদর্শগত ধারণার বিকাশের (ে ত্রে খুবই গু(ত্বপূর্ণ। আসলে ভারতে ব্রিটিশ রীতিগুলো ইউরোপীয় চিন্তাভাবনার বৃত্তেই ঘোরাফেরা করত এবং ভারতে ইংরেজী সভ্যতার ধারক মিশনারীরা খোলাখুলিভাবে এক মিশ্ররীতির প(নিয়েছিল। ব্রিটেন তার ছায়া ভারতবর্ষের বুকে স্থাপিত করতে চেয়েছিল। দৈহিক এবং মানসিক দূরত্ব যা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বিজ্ঞানের আবিষ্কার, বাণিজ্যিক আদানপ্রদান, ইংরেজী আইন এবং ইংরেজী শি(া বলবৎ হওয়ার ফলে। ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেনটিঙ্ক গভর্নর জেনারেল ভারতে আসার পরে ব্রিটিশরা সংস্কার করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। ব্রিটিশ শাসন ভারতকে উন্নত করবে—এই ভ্রান্ত আশাকে মুক্ত(ব্যবসায়ী, উপযোগিতাবাদী এবং ইভানজেলিকালরা সামন্ততান্ত্রিক পরিচালনার একটা স্বতন্ত্র ভাবধারা প্রণয়ন করেছিল যা উদারনৈতিক মতবাদের দ্বারা গঠিত ছিল। নেপোলিয়নের যুগের পরবর্তী সময়ে ব্রিটেনের

বি(েব্যাপী দমনরীতি, শিল্প-বিপ্-বের ফসল, এবং নতুন আদর্শের গঠন হিসেবে উদারনীতিকে আর শুধু সাম্রাজ্য পরিচালনার উপায়ের পথ হিসেবে ভাবা হত না। অ্যাডাম স্মিথ এবং জেরেমি বেনথ্যাম-এর ভাবনা অনুসারে এই তথ্যে উপনীত হওয়া যায় যে ব্রিটেনকে পুনর্গঠন করার এটা একটা উপায় মাত্র। উদারনৈতিকরা ধারণা করেছিলেন যে মানুষের প্রকৃতি সবজায়গাতেই সমান এবং তা সম্পুর্ণরূপে পরিবর্তিত হতে পারে আইন, শি(া এবং মুক্ত(বাণিজ্যের কর্মপদ্ধতি দ্বারা। তারা ব্যক্তি(-মানুষকে পুরোহিত, স্বৈরাচারী এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের যুগ প্রাচীন বন্ধন থেকে মুক্ত(করার লে(্যে ছিলেন যাতে তারা স্বশাসিত, যুক্তি(বাদী, বিবেচনা এবং পছন্দের সঙ্গে জীবন নির্বাহ করতে পারে। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে তারা বি(েব্র প্রতিটি দেশের, প্রতিটি মানুষের জন্যই বলেছেন।

ভারতীয় সমাজের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এক দৃষ্টান্তমূলক পরিচয় বহন করে জেমস মিল-এর ১৮১৪ সালের হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'। মিল ভারতবর্ষকে সত্যিকারের রাষ্ট্র হিসেবে সভ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। ভারতের শিল্প, উৎপাদন, সাহিত্য, ধর্ম এবং আইনকে চুলচেরা বি(ে-ষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে হিন্দুরা কখনই এবং কোনভাবেই সভ্যতার শীর্ষে পৌঁছতে পারেনি। ভারতকে এই জড়তা থেকে মুক্ত(এবং উন্নতির রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মিল একটা সহজ এবং অবশ্যম্ভাবী উপায় বলেছিলেন। বেনথ্যামের মতই তিনি করের স্বল্পতা এবং ভালো আইনের ওপরই জোর দিয়েছিলেন যা সারা পৃথিবীর জাতি এবং ব্যক্তি(র উন্নতি সাধন করবে। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর বাবার কাছ থেকে উদারনীতির নেতৃত্বে দেওয়ার (মতা এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধনে জড়িত হওয়ার এক স্বাভাবিক প্রবণতা পেয়েছিলেন। উদারনীতি সম্পর্কে তাঁর মতবাদ সর্বজনবিদিত, সেখানে তিনি বলছেন যে সুখের বাইরেও উদারতার একটা নিজস্ব সহজাত মূল্য আছে। তিনি মানুষকে সহজাত স্বার্থপর হিসেবে দেখেননি বরং সেই স্বার্থপরতা বাইরের আইনের দ্বারা সম্পৃক্ত(, এই ধারণা তাঁর বাবার থেকে একেবারেই ভিন্ন। জনসাধারণের ভালো এবং নিজেদের সাহায্য করার জন্য তাদের চারিত্রিক বিকাশের পথে শি(নীয় করে তোলা দরকার। তিনি এটা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে দ(সরকার এবং শি(া ভারতবর্ষের মানুষকে এমনভাবে পরিবর্তিত করবে যে তাদের স্বাধীনতার দাবিকে আর দমিয়ে রাখা যাবে না। তিনি বেনথ্যামের উপযোগিতাবাদের কাঠিন্যকে প্রত্যাখ্যাত করে মানসিক ঔদার্যনীতির প(ে মত দিতে চেয়েছিলেন। ই. স্টোক্স-এর মতে উদারনীতির আলঙ্কারিক প্রকাশ সব থেকে বেশি পাওয়া যায় ম্যাকলের মতামতের মধ্যে। ম্যাকলে এবং সমসাময়িকদের কাছে ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধনের প্রকৃতি ছিল ভঙ্গুর এবং অস্থায়ী। তিনি বলেছিলেন প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ এক ধরণের ইংরেজ শি(ায় শি(িত মধ্যবত্তি শ্রেণী গড়ে তোলা ''যারা আমাদের এবং আমাদের শোষিত মানুষদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে—এক শ্রেণীর মানুষ যাদের গায়ে ভারতীয় রক্ত(বইছে, কিন্তু যাদের মতামত, আদর্শ, বুদ্ধি, চিন্তাভাবনা হবে ইংরেজদের মত।''

সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া প্রাচ্যবাদ

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ের প্রাচ্য পন্ডিতেরা অতীত ভারতের প্রাচীন নিদর্শনগুলির মূল্যবান এবং বিশাল ইতিহাস পুর্নগঠন করেছিলেন। এই ইতিহাসের মুখোমুখি হয়ে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে শুধুমাত্র গ্রাম এবং সামন্ততান্ত্রিক নীতির 'অপরিবর্তিত' অবস্থান হিসেবে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। ভারতের বিস্তৃত অতীত ব্রিটিশ রাজের দরবারে ব্যাখ্যাত হওয়া এবং সহায়ক হয়ে ওঠা প্রয়োজন। পশ্চিমী সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত ব্যক্তি(বাদ এবং উদারতায় মত মূল্যবোধগুলির দিকে উল্লেখ করে ব্রিটিশরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর জোর দিতে পারবেন যেমন পেরেছিলেন জেমস এবং জে. এস. মিল। তারা প্রাযুক্তি(ক শৌর্য দেখিয়েও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে। এই অর্থে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান ছিল। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ দখল করল এবং ১৮৫০ সালের মধ্যে তারা রেলপথ তৈরী করল এবং টেলিগ্রাফের জাল বিস্তার

করল যার পরিকল্পনা ছিল ইউরোপের, ভারতের নয়। মাইকেল অ্যাডাম-এর মতে এই প্রাযুক্তি(ক শ্রেষ্ঠত্ব মেরী কিংসলের মত দেশীয় সমাজের নরমপন্থীদের কাছেও সাম্রাজ্যবাদী দমনরীতির একটা ব্যাখ্যা, 'আমার জাতির শ্রেষ্ঠত্বের একবড় নিদর্শন'। শ্রেষ্ঠত্বের এই বি(্বাসের বি(দ্ধে আপত্তি তুলেছিলেন এডওয়ার্ড সঈদ। তিনি পশ্চিমী লেখকদের সঙ্কীর্ণতাকে নিন্দে করেছেন যারা অ-পশ্চিমী সভ্যতাগুলোকে 'অন্যান্য' এবং তার ফলে হীন আখ্যা দিয়েছেন। অন্যান্য সভ্যতার প্রতি পশ্চিমী শ্রেষ্ঠত্বের এই সাহসী ঘোষণা এবং অ-পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি একদেশদর্শী মনোভাবকে নিন্দে করেছেন সঈদ।

সাড়ে তিনশ বছরের ব্যবসা, দুশো বছরের রাজনৈতিক (মতা এবং একশ তিরিশ বছরের ভারতবর্ষের বুক থেকে ব্রিটিশ শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটেছিল। ম্যাকলে, এলফিনস্টোন এবং তাঁদের সমসাময়িকদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল যা তাঁরা নিজেরাও আশা করতে পারেননি। তাঁরা হয়ত একে আংশিকভাবে অস্বীকার করবেন কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাঁরা তাঁদের দুরদর্শিতাকে অনুভব করতে পারবেন, কারণ দেড়শ বছর আগে ব্রিটিশ কূটনৈতিক দৌত্য এবং সেনাবাহিনীর শাসিত প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষের অনেক পার্থক্য। যদিও বর্ণে, রক্তে(ভারতীয় কিন্তু মননে, আদর্শে ইংরেজ—এইরকম এক শ্রেণী গড়ে ওঠেনি, তবুও ম্যাকলে এবং মুনরোর মতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছিল ভারতবর্ষে। একজন অমনোযোগী পর্যবে(ক প্রভাবিত করবে ভারতীয় সমাজের গঠনরীতি, এ দেশের জমিতে পশ্চিমী আদর্শ এবং চিন্তা-ভাবনা, নতুন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নতুন মূল্যবোধ-এর শিকড় স্থাপিত হয়েছিল।

প্রথম বি(্বযুদ্ধের পর 'হোম গভর্নমেন্ট' আর্থিক এবং রাজনৈতিক বিপন্নতার মুখে পড়ে এবং তার ফলে ভারত থেকে ঔপনিবেশিক শাসনকে তুলে নেওয়ার জন্য আলোচনা চলতে থাকে। এটা দাবি করা হয় যে ভারতের কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা চাপ সৃষ্টির ফলে নয় বরং এটা ছিল স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু এর নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল। ভারতীয় রাজ্যগুলোকে স্বশাসিত করার জন্য প্রদান করা হল এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীকে হঠিয়ে তাদের জায়গা দখল করতে আরম্ভ করল। দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধ, আই.এন.এ'র সংগ্রাম এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের চাপ সৃষ্টির ফলে ব্রিটিশ সরকার (মতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্যে ওয়েভেল, মাউন্টব্যাটন প্রভৃতি ব্যক্তি(ত্বদের (মতা হস্তান্তরের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার জন্য পাঠানো হল। এটা ছিল তুলির শেষ টান। ব্রিটিশরা সম্মানজনকভাবে ভারত ত্যাগ করল এবং ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করল।

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি আকুলতা আরও উৎসাহিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী অনুভূতির দ্বারা। কংগ্রেস ব্রিটিশদের বি(দ্ধে যে তার্কিক বিষয়গুলি উত্থিত করেছিল তার উৎপত্তি ছিল পশ্চিমী চিন্তাভাবনা থেকে। ভারত ব্রিটিশদের বেড়ি ভেঙেছিল পশ্চিমী হাতুড়ির দ্বারা। কোন কোন পন্ডিতদের মতে ভারতবর্ষের র(াকর্তা হিসেবে ব্রিটিশরা এইভাবে তাদের মহৎ কার্য সম্পাদন করেছিল।

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. টি আর. মেটকাফ—আইডিওলজিস অফ দ্য রাজ

২. এরিক স্টোকস—ইংলিশ ইউটিলিটারিয়ানস অ্যান্ড ইন্ডিয়া

৩. জে. ডি. বিয়ার্স—ব্রিটিশ অ্যাটিউডস টুওয়ার্ডস ইন্ডিয়া

৪. এডওয়ার্ড সঈদ— ওরিয়েন্টালিজম

৯.৬ অনুশীলনী

১. ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্‌দের ভারত সম্বন্ধে ধারণার কথা আলোচনা কর।

২. বিট্রিশ ইভানজেলিস্ট এবং উপযোগীবাদীদের চিন্তা-ভাবনার কথা আলোচনা কর।

৩. ব্রিটিশ উদারতার পশ্চাতে প্রধান চিন্তাগুলো কি ছিল?

৪. সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে নয়া প্রাচ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?

একক ১০ ❑ পাশ্চাত্য প্রভাব এবং ভারতের প্রতিত্রি(য়া

গঠন

১০.০ পাশ্চাত্য প্রভাব এবং ভারতের প্রতিত্রি(য়া
১০.১ বাংলা রণেশাঁস অথবা নবজাগরণ
১০.২ প্রার্থনা সমাজ
১০.৩ আর্য সমাজ
১০.৪ থিওজফিকাল সোসাইটি
১০.৫ গ্রন্থপঞ্জি
১০.৬ অনুশীলনী

১০.০ পাশ্চাত্য প্রভাব এবং ভারতের প্রতিত্রি(য়া

ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে ঊনিশ শতক এক অদ্বিতীয় জায়গা অধিকার করে আছে। মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর থেকে এবং বছরের পর বছর নানা সংগ্রাম এবং ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে জেগে উঠেছিল এক নতুন ভারতবর্ষ। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনিশ শতকের সূচনায় বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের এক বেদনাদায়ক ছবি পরিস্ফুট হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ, এই অন্ধকারের মধ্যেও একটা আলোকরেখা দেখা গিয়েছিল। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাব, ইংরেজী শি(ার সূচনা এবং বেকন, লক, ভলতেয়ার বার্ক, বেনথাম, মিল এবং অন্যান্য পন্ডিত ব্যক্তি(দের শি(ার মাধ্যমে পশ্চিম এবং পশ্চিমী চিন্তা ভাবনার সঙ্গে সংযোগের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে এক নতুন যুগের উদয় ঘটল। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ এবং ইংরেজী শি(ায় শি(িত বুদ্ধিজীবিদের পশ্চিমী প্রভাব ছাড়া উদয় ঘটত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ, অনুমান করা যায় যে বাইরের প্রভাব এবং ভেতরের উদ্দীপনার যোগসূত্রেই এই দৃষ্টান্তমূলক ফলাফলের কারণ যা নতুন যুগ আলোকিত করে। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে ভারতীয় নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সেই নীতি যেখানে ভারত নিজের মর্যাদা অ(ুণ্ণ রেখেই আধুনিক সভ্যতার মূল স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল বাইরের জগতে....'' এন. এস, বোসের মতে 'ভারতের নবজাগরণ হচ্ছে পশ্চিমী উৎকর্ষতার এবং বিস্মৃতি প্রায় অতীত ভারতের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের গরিমার একটি সং(িষ্ট উপাদান।'

ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান ভারতে প্রবেশ লাভ করেছিল ইংরেজী শি(ার বাতায়ন দিয়ে যা ভারতীয় মননকে উর্ব্বর করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একশ বছর পরে ঔপনিবেশিক শক্তি(প্রয়োগ করে ভারতবর্ষের মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে সাংস্কৃতিক দমনরীতি প্রয়োগ করা হয়নি। কোম্পানির সরকার ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত সরকারিভাবে ইংরেজি শি(াকে অনুমোদন করেনি। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, ম্যাডরাস এবং বম্বেতে তিনটে বি(বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পরে ভারতের মানুষ প্রথাগতভাবে এবং পরিকল্পনা সহকারে ইংরেজী শি(া নিতে আরম্ভ করে। ঊনিশ শতকের প্রথমভাগে ভারতীয়দের এবং খ্রীশ্চান মিশনারীদের উদ্যোগে ইংরেজি শি(ার প্রসারণ ঘটে। এফ. ডব্লিউ থমাসের মতে ভারতবর্ষে শি(া একেবারে অদ্ভুত কোন ঘটনা ছিল না। এটা এমন একটা দেশ যেখানে শি(ার প্রতি ভালোবাসা খুব প্রাচীনকাল থেকে মূর্তমান ছিল এবং এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী এবং শক্তি(শালী ছিল। যাইহোক, ভারতে

বিশেষ করে বাংলায় শি(ার এক সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য মূর্ত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে সংস্কৃত শি(ার জন্য টোল বা প্রতিষ্ঠানগুলি, আরবী এবং পার্সি শি(ার জন্য মাদ্রাসা, মাকতাব ও পাঠশালা অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শি(াপ্রণালীর অবস্থা একেবারেই ভঙ্গুর ছিল।

পলাশী যুদ্ধের পর, প্রশাসনিক এবং ব্যবসায়িক কাজকর্মের আদান প্রদানের জন্য ভারতীয়রা অনেক বেশি করে ইংরেজদের সংস্পর্শে আসতে আরম্ভ করল, তার ফলে তাদের ভাষা সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে আরম্ভ করল। ১৭৩১ সালের একেবারে প্রথমদিকে কলকাতায় 'বেলানী চ্যারিটি স্কুল' নামক একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৮০০ এবং ১৮১৪ সালের মধ্যে কলকাতায় এবং চিনশুরায় অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত(ইংরেজী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা পাঠ্যপুস্তকগুলি তৈরী এবং প্রকাশ করার দায়িত্ব নিল 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারী স্থাপিত হিন্দু কলেজে ভারতীয় ভাষা শি(ার পাশাপাশি, ইংরেজী শি(াও চালু করা হয়েছিল।

এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, প্রথমে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার শি(ার ব্যাপারে কোনরকম আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাচ্য বিদ্যা প্রসারণের (ে ত্রে কিছুটা আগ্রহ দেখালেও, তিনি ১৭৮১ সালে ক্যালকাটা মাদ্রাসা নামে মাত্র একটি শি(া প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সেখানে আরবী এবং পারসী ভাষা শি(াই একমাত্র গু(ত্ব পেত, বিশেষ মুসলিম আইন। তার ঠিক এক দশক পরে অর্থাৎ ১৭৯১ সালে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন জোনাথন ডানকান। বাংলা গদ্যসাহিত্যকে উন্নীত করার ল(্যে ১৮০০ সালে ওয়েলেসলির দ্বারা স্থাপিত হয় ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ। উইলিয়াম ক্যারি, একজন ব্যাপটিস্ট মিশনারী বাংলা ভাষায় অনেক কাজ করেছেন যার মধ্যে বাংলা ব্যাকরণ এবং বাংলা-ইংরেজী অভিধান লিখেছিলেন। ১৮১১ সালের ৬ মার্চ গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো স্মরণীয় বক্ত(ব্যকে ধরে নেওয়া হয় শি(া (ে ত্রে সরকারের প্রথম পদ(ে প যা 'অ(র জ্ঞানকে পুন(জ্জীবিত' করার ওপরে জোর দিয়েছিল।

সরকারী প্রথার সবথেকে পরবর্তী গু(ত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে ১৮১৩ সালের সনদ আইন। সাধারণের রাজস্বে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতবর্ষে শি(ার অধিকারের এটা একটা প্রথম আইনসংক্র(ান্ত পদ(ে প। এখানে বলা হয় ভারতের রাজস্বের উদ্‌বৃত্ত থেকে দেশীয় সাহিত্যকে পুন(জ্জীবিত ও উন্নত করার জন্য ভারতবর্ষের শি(িত মানুষদের উৎসাহিত করার জন্য এবং ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অধিবাসীদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন এবং শি(ার জন্য গভর্নর জেনারেলকে বছরে কম করে একলাখ টাকা ব্যায় করতে হবে। বস্তুতঃ এই সুবিদিত চুক্তি(ভারতবর্ষের (ে ত্রে ব্রিটিশ শাসনের এক গু(ত্বপূর্ণ দিক। এ. সি. ব্যানার্জ্জির মতে, ১৮১৩ সালের সনদ আইন ইভানজেলিস্টদের চাহিদা অনুসারে প্রণীত হয়েছিল এবং মিশনারীদের জন্য ভারতবর্ষের দ্বার উন্মোচিত হয়ে গেছিল। কিন্তু কোম্পানির বক্ত(ব্য ছিল যে প্রাচ্য শি(ার জন্য অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ প্রদান করার জন্যই এই সনদ আইন বলবৎ করা হয়েছিল। নতুন শি(া প্রণালীর বিকাশের (ে ত্রে এটা ব্যর্থ হয়েছিল এবং প্রায় এক দশক ধরে সনদের দ্বারা যে অর্থ অনুমোদিত হয়েছিল তা ব্যায় করা হয়নি। ভারতীয়দের অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখার প্রথাকে অনেকেই সমর্থন করেছিল। লর্ড হেস্টিংস 'ভুল' ধারণা সম্বন্ধে বলেছেন যে সাধারণ মানুষের মধ্যে তথ্যের সম্প্রসারণ ঘটা মানেই তারা কর্তৃপ(ের দ্বারা কম পরিচালিত হবে এবং তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করবে।

এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বহু মিশনারী গোষ্ঠী ইংল্যান্ডে ভীষণভাবে প্রণল্‌ভ এবং শক্তি(শালী হয়ে উঠেছিল এবং ভারতবর্ষে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচারের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ উপযোগীবাদীরাও ভারতের সমাজ ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। নতুন শি(ার আংশিক প্রয়োগে যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি(আরও দৃঢ় হয় কিন্তু ইংরেজী ভাষাকে ভারতীয় শি(াপদ্ধতির একমাত্র মাধ্যম হিসেবে সমর্থন করেননি। সুতরাং সরকার

খুবই দ্বিধান্বিত ছিল ১৮১৩ সালের সনদ আইনের প্রবর্তনের এক দশক পরেও, সরকার স্পষ্ট শি(াপদ্ধতি প্রয়োগ করার (ে ত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ হল। ১৮২৩ সালে সরকারের শি(া পদ্ধতির একটা স্থির পরিবর্তন প্রথম পরিলি(ত হয়।

১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্ট কলকাতায় স্থাপন করেন সংস্কৃত কলেজ যা প্রাচ্যবিদ্যার পুরোনো পদ্ধতিকে উৎসাহিত করার একই ধারা বাহন করে চলে। একই বছরে কলকাতায় স্থাপিত 'জেনারেল কমিটি' অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন'-এর কাজ ছিল সারা বাংলায় শি(ার গুণগত অবস্থার খবর সংগ্রহ করা এবং মানুষের মধ্যে আরো সচেতনতা বৃদ্ধি পথ এবং উপায় নির্দেশ করা। একই বছরে রামমোহন রায় আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে শুধু সংস্কৃত শি(া প্রদানের জন্য এই কলেজ স্থাপনের প্রতিবাদ করেন এবং তাঁর কাছে বিনীত আবেদন করেন যে আরও উদার এবং আলোকিত শি(া যেমন অঙ্কশাস্ত্র, দর্শন, রসায়ন, শারীরবিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য (ে ত্রগুলোকে তুলে ধরা। আসলে হিন্দু বুদ্ধিজীবিরা পশ্চিমী শি(ার গু(ত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং ইংল্যান্ডে হিন্দু বিদ্বোদজনেরা জেমস মিল-এর মত একজন শক্তি(শালী সমর্থক পেয়েছিলেন যাঁর কাছে উপযোগিতা ছিল শি(ার পরশ-পাথর। আপে(িকভাবে মিলের দ্বারা প্রভাবিত একটি আবেদনপত্রে প্রাচ্য বিদ্যার ওপর পশ্চিমী শি(ার শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লিখিত ছিল যা ১৮২৪ সালে কোর্ট অফ ডিরেক্টার্সদের দ্বারা প্রেরিত হয়।

১৮২৪ সালে কোর্ট অফ ডিরেক্টার্সদের আবেদনপত্রে সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে সেই শতকেই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমী শি(ার একটি (ে ত্র তৈরী হল। কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যুব শাখার একটা অংশ এই প্রথাকে সমর্থন করেছিল, তার ফলে তাদেরকে 'অ্যাংলিসিস্ট' আখ্যা দেওয়া হল। প্রধানতঃ এই প্রথার বি(দ্ধাচরণ করেছিলেন প্রবীণেরা—এইচ. টি. প্রিন্সেপ-এর মত বিশিষ্ট ব্যক্তি(বর্গ—যাঁরা প্রাচ্য বিদ্যাকে চালু রাখার জন্য সরকারী উদ্যোগের জন্য আবেদন রেখেছিলেন, তাঁদেরকে 'ওরিয়েন্টালিস্ট' আখ্যা দেওয়া হয়। এই দুই গোষ্ঠী বিতর্ক আরো প্রেরণা পেল বেনটিঙ্কের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর—যিনি শি(ার (ে ত্রে, অথবা যন্ত্রের, অথবা মানুষের চরিত্রের উন্নতির (ে ত্রে উপযোগীবাদে বি(াসী ছিলেন। গভর্নর জেনারেলের সর্বজনবিদিত মতামতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, 'অ্যাংলিস্ট'দের আবেদন আরও জোরদার হল এবং কলকাতা সংস্কৃত কলেজ এবং কলকাতা মাদ্রাসায় চিকিৎসা শাস্ত্রের পড়ানো বন্ধ করে দিতে স(ম হল। আইনজ্ঞ ম্যাকলেকে তারা তাদের নেতা বানিয়েছিল যিনি 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকসন' এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৩৫ সালে ম্যাকলে তাঁর সর্বজনবিদিত বক্তৃ(তায় (Minute) এ ইংরেজি শি(ার প(ে বক্ত(ব্য রাখেন। সংস্কৃত আরবী, অথবা পারসী ভাষা সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না তবুও প্রাচ্যের এই প্রাচীনতম ভাষাগুলো সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা জানাতে দ্বিধা করেননি। তাঁর মতে ভারত এবং আরব দেশের সমস্ত দেশীয় সাহিত্যের থেকে ইউরোপের একটি ভালো গ্রন্থগারের একটা আলমারির গ্রন্থসমূহ অনেক উৎকৃষ্টমানের পরিচয় বহন করে। তিনি ভেবেছিলেন যে যেহেতু ভারতীয়দের তাদের নিজেদের প্রাচীন ভাষা অথবা মাতৃভাষায় শি(িত করে গড়ে তোলা যাবে না। তাই তাদের বিদেশী ভাষা, বিশেষ করে, ইংরেজী ভাষায় শি(া প্রদান করা হবে। যেহেতু ভারতের মত বিশাল জনবহুল দেশে শি(ার জন্য সরকারী উপাদান খুবই অপর্যাপ্ত ছিল, তাই তারা ইংরেজী শি(ায় শি(িত একটি ছোট গোষ্ঠী তৈরি করার লে(্যে ছিল—যারা ইংরেজ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুবাদকের কাজ করবে—এই শ্রেণীর মানুষের রক্তে(, বর্ণে ভারত মিশে থাকবে কিন্তু মননে, আদর্শে, মতামতে হবে ইংরেজ। এই নতুন শ্রেণী বিশাল জনসম(ের কাছে পশ্চিমী শি(ার ফিল্টার হিসেবে কাজ করবে। ম্যাকলে একে 'ফিলট্রেসান থিওরি' বা 'বিশোধন তত্ত্ব হিসেবে প্রচার করেছেন। তাঁর এই বক্ত(ব্য স্বীকৃত হল এবং ১৮২৪, ১৮২৭ এবং ১৮৩০ সালে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টার্স'-এর পরিচালক গোষ্ঠীর দ্বারা এই বিষয়টার অনুমোদিত হল। ১৮৩০ সালে কোর্ট অফ ডিরেক্টার্স দ্বারা অনুমোদিত ইংরেজী ভাষার আস্তে আস্তে সূচনা ঘটল সাধারণ মানুষের ব্যবসায়ী বিভিন্ন (ে ত্রগুলোতে... যাতে দেশের মানুষদের কাছে এই ভাষা আরও স্পষ্ট হয়। সেই সময় যেহেতু কেরানী এবং সাধারণ কর্মচারীদের চাকরি পাওয়া সম্ভব

ছিল তাই পরবর্তী সময়ে এটা অনুমান করা হয় যে কোম্পানির শি(াপ্রণালী শুধুমাত্র 'কেরানী তৈরীর' ল(েই নিবেদিত ছিল।

১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ পরিষদে গভর্নর জেনারেল একটি আবেদন রাখলেন যেখানে বলা হয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হল যে ইউরোপীয় সাহিত্য এবং বিজ্ঞানকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া এবং শি(া খাতের সব অর্থ সবথেকে বেশি বিনিয়োগ করা হবে শুধু ইংরেজী শি(ার (েত্রে। ১৮৩৫ সালের জুন মাসে কলকাতা মেডিকেল কলেজের স্থাপনের ফলে এই জয় নিশ্চিত হল। সংসদের ভাষা হিসেবে ১৮৩৭ সালে পারসির জায়গা দখল করল ইংরেজী ভাষা। ১৮৪৯ সালে হার্ডিং সেই সব ব্যক্তি(দের যাদের ইংরেজী শি(া আছে তাদেরই সরকারী চাকরি দেবার প্রথা চালু করলেন। এটা ইংরেজী শি(ার প্রচলনের (েত্রে আরও বেশি শক্তি(শালী ভূমিকা পালন করল। 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্টিটিউশন'কে সরিয়ে ১৮৪২-৪৩ সালে বিদ্যালয়গুলি শি(াপরিষদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসার পর, ১৮৪৩ সালে ২৮ থেকে ১৮৫৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫১।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে খ্রীশ্চান মিশনারীরা ইংরেজী শি(া প্রসারের (েত্রে অনেক গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা অনেক বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় খুলেছিল এই আশা করে যে পশ্চিমী শি(ার আলোতে ভারতীয়রা খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে। ১৮১৮ সালে স্থাপিত অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন কলেজ সবথেকে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮২০ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় বিশপ'স কলেজ এবং ১৮৩০ সালে আলেকজান্ডার ডাফ প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতায় জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন। মিশনারীরা তাদের বি(াস ছড়িয়ে দেওয়ার (েত্রে কম সাফল্য লাভ করেছিল, কিন্তু তাদের শি(াদানের প্রচেষ্টাকে মানুষ স্বাগত জানিয়েছিল।

১৮৫৪ সালের জুলাইতে, স্যার চার্লস উড 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল'-এর সভাপতি শি(ার ব্যাপারে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। কোম্পানির ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় যে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বি(বিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত একটা স্পষ্ট শি(া প্রণালী তৈরী করা। ইংরেজী এবং আঞ্চলিক ভাষা শি(ার উন্নতি এবং প্রসারের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। মূল আবেদনগুলো ছিল।

১. শি(া পরিচালনা করার জন্য আলাদা সাংবিধানিক দফতর তৈরী করা।

২. মূল 'প্রেসিডেন্সি' শহরগুলোতে বি(বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

৩. বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য শি(কদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা উচিৎ আলাদা প্রতিষ্ঠানে।

৪. অবস্থানরত সরকারি কলেজ এবং উচ্চ বিদ্যালয় দেখভাল করা এবং প্রয়োজনে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে।

৫. নতুন মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে।

৬. আঞ্চলিক ভাষার বিদ্যালয়গুলিতেও সমান নজর দিতে বলা হয়েছে।

৭. জনগণের তহবিল থেকে বেসরকারী শি(া প্রতিষ্ঠানগুলোতে দান করার বন্দোবস্তের কথাও বলা হয়েছে।

শি(া দফতরের প্রতিষ্ঠা খুব তাড়াতাড়ি শু(হয়ে গেল। ১৮৫৭ সালের মধ্যেই তিনটে বি(বিদ্যায় স্থাপিত হল(২৪ জানুয়ারীতে কলকাতা ১৮ জুলাইতে বম্বে এবং ৫ই সেপ্টেম্বরে মাদ্রাজ। ভারতীয় উপমহাদেশে অবশেষে পশ্চিমী

শি(া তার দীর্ঘ পরিত্র(মার পর দৃঢ়ভাবে তার স্বীকৃত স্থান পেল, যদিও প্রথমদিকে মুসলিমরা কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি, কিন্তু আস্তে আস্তে হিন্দুদের মত তারাও একে গ্রহণ করল।

ভারতীয় খননে এই পশ্চিমী শি(ার প্রভাব খুব উদ্দীপনার সঙ্গে এক যুগান্তকারী বিপ-ব এনে দিয়েছিল, এই পুনর্নবীকরণ উদ্দীপিত করেছিল যার প্রতিফলন দেখা যায় সাধারণ মানুষের জীবনের এবং চিন্তাভাবনায়। এই ঐতিহাসিক এবং দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাকে ভারতীয় নবজাগরণ, ভারতীয় বিপ-ব, ভারতের পুন(খান হিসেবে বিভিন্নভাবে আখ্যায়িত করা হয়। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে এখান থেকেই আধুনিক ভারতের জাগরণ ঘটেছিল, এবং বাংলাই এই জাগরণের মূল কেন্দ্র ছিল। ভারতীয় নবজাগরণ এবং বাংলা নবজাগরণ এই দুটো আখ্যাই এসেছে ইউরোপীয় নবজাগরণ থেকে, এবং একইভাবে বাংলার ভূমিকাকে ইতালির সঙ্গে এবং কলকতার ফ্লোরেন্সের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে, যদিও এই তুলনামূলক আলোচনাগুলো খুবই আপে(িক এবং ভ্রান্তিকর তবু সাধারণ অর্থে এই তুলনাগুলি কিছুটা হলেও ঊনিশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসে খুবই উপযুক্ত(। বাংলাতেই প্রথম ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, পশ্চিমী শি(ার প্রসারণ ঘটে এবং নতুন অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্ম হয় যা এই জাগরণে অগ্রভাগে ছিল।

১০.১ বাংলা রনেশাঁস অথবা নবজাগরণ

অনেক আধুনিক পন্ডিতদের মতে ঊনিশ শতকের প্রথম আবার কোনো বিদ্বদজনের মতে পুরো ঊনিশ শতক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জাগরণের মধ্য দিয়ে বাংলা রনেশাঁস তথা নবজাগরণের সা(্য বহন করে। ইউরোপীয় ভঙ্গিতে রণেশাঁস শব্দটিকে দাবি করে। তাঁরা বি(্বাস করতেন যে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে বাঙালী বুদ্ধিজীবিরা জীবন এবং বি(্বাস সম্বন্ধে অনেক প্র(্ন শিখেছিলেন। মূলতঃ সমসাময়িক জীবনে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ভীষণ ভাবে সাড়া ফেলেছিল। বিভিন্ন আন্দোলন, সমাজ এবং প্রতিষ্ঠান গঠন, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তন, রাজনৈতিক সচেতনতা, এবং আরও উদীয়মান সামাজিক—রাষ্ট্রিক ঘটনাগুলো রনেশাঁস-এর বাস্তবিক রূপ। রনেশাঁস তত্ত্বের প্রবক্ত(ারা এই ঘটনাসমূহের উৎপত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন ইউরোপীয় বিদ্যার মধ্যে (বিশেষতঃ দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য), যা ইংরেজী শি(ার মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়েছিল। যদিও এই শি(া খুব শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার হিন্দু সমাজের উঁচু স্তরের মানুষদের মধ্যে, তবু আংশিকভাবে মুসলমানদের ও অন্যান্যদের মধ্যে এমনকি শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসেও উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ে।

নবজাগরণের ধারক ছিলেন, রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) ও তাঁর যুক্তি(বাদী শিষ্য, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ও তাঁর অনুগামীরা, অ(য়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬), ঈ(্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৫-৯৪) এবং স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। পশ্চিমী ধারণা যা রনেশাঁস চিন্তক এবং আন্দোলনকারীদের প্রভাবিত করেছিল তাদের মধ্যে যুক্তি(বাদ, মানবতাবাদ, উপযোগিতাবাদ, বিজ্ঞান মনস্কতা, ব্যক্তি(বাদ, দৃষ্টবাদ, ডারউইনবাদ, সমাজবাদ এবং জাতীয়তাবাদ। ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬), আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭), জেরেমি বেনথ্যাম (১৭৪৮-১৮৩২), থমাস পেইন (১৭৩৭-১৮০৯), অগাস্ট কমটে (১৭৯৮-১৮৫৭), চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২) এবং জন স্টুয়ার্ট মিল (১৬০৬-৭৩) এই কয়েকজন আধুনিক মনস্ক পশ্চিমী চিন্তকেরা বাংলার রনেশাঁস চিন্তকদের মধ্যে তাঁদের অনুগামী পেয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল (প্রতিষ্ঠিত ১৭৮৪), ব্যাপটিস্ট মিশন অফ শ্রীরামপুর (১৮০০), ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭),

ক্যালকাটা মেডিকাল কলেজ (১৮৩৫), কলকাতা বি(েবিদ্যালয়-এর মত প্রতিষ্ঠানগুলির রনেশাঁস (ে ত্রে অবদান অনস্বীকার্য।

নবজাগরণের দুটো ধারা হচ্ছে ১. বহুল সংখ্যায় সংবাদপত্র এবং মাসিক পত্রিকার প্রকাশ এবং ২. বিভিন্ন সমাজ সঙঘ এবং সংস্থার উত্থান। রণেশাঁস প্রবর্তিত বিভিন্ন মত বিনিময় করার জন্য এগুলোই বিভিন্ন কার্যালয়ে রূপায়িত হয়। যাইহোক, রণেশাঁস-এর সবথেকে দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ছিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি। আর একটা প্রধান ধারা ছিল যুক্তি(বাদী চিন্তাভাবনার প্রকাশ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে ঠেকানোর জন্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উত্থান, পশ্চিমী শি(া এবং ভাবনার প্রসারণ, তপ্ত এবং বিচিত্র বুদ্ধিমান জিজ্ঞাসা এসবই রনেশাঁস-এর ফল। বাংলা রনেশাঁস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে একযোগ হয়েছিল, এবং তার ফলে জাতীয়তাবাদ দেশে বিদেশের শাসনাধিকার নিয়ে প্র্ন তুলেছিল।

রামমোহন রায় সংস্কৃত, আরবী, পারসি এবং পশ্চিমী ভাষায় দ(ছিলেন। তাঁর তৌফত-উল-মুয়াহহিদীন অথবা গিফট্ ফর মোনোথিসিস (১৮০৩-০৪) ধর্মমত সংত্র(ান্ত প্রস্তাবের একটি যুক্তি(বাদী লেখা। তিনি পরবর্তীকালে, যুক্তি(বাদ এবং উপযোগীতাবাদকে মিশিয়ে একটি সেমিটিক ধরনের মোনোথিজম প্রবর্তন করেন এবং সামাজিক অন্যায় এবং অসাড় বোধজ্ঞানকে সরিয়ে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করার চেষ্টা করলেন। পনেরো বছরের (১৮১৫-৩০) হিন্দু এবং খ্রীশ্চানদের বিরোধকে মেটাতে গিয়ে তিনি আপে(কভাবে বহু ঈ(রবাদ এবং ত্রিত্ববাদকে হারিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল ব্রাহ্মমতে একে(রবাদ। তিনি সামাজিক ন্যায়ের জন্য শতাব্দী প্রাচীন বিরোধ উত্থান করেছিল। বিশেষতঃ হিন্দু নারীদের মুক্তি(র ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৮২৯ সালে ঔপনিবেশিক সরকার গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর নেতৃত্বে 'সতী' প্রথা দমন করলেন এবং রামমোহন একে সমর্থন করেছিলেন। রামমোহন রায় আবার ছাপাখানার স্বাধীনতার জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন এবং পশ্চিমী পাঠত্র(মের সাহায্যে অসাম্প্রদায়িক এবং বৈজ্ঞানিক শি(া পদ্ধতি চালু করার প(রায় দিয়েছিলেন।

হেনরি ডিরোজিও একজন মুক্ত(চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের ইউরোপীয় সাহিত্য এবং ইতিহাসের শি(ক ছিলেন (১৮২৬-৩১) এবং তাঁর ছাত্রদের স্বাধীন এবং প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা করার দিকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। টম পেইন-এর 'এজ অফ রিজন' এবং 'রাইটস্ অফ ম্যান'-এর আগ্রহী পাঠক ছিলেন এই যুবকেরা। 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত এই যুবকেরা প্রায় পনেরো বছর ধরে (১৮২৮-৪৩) ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান নামে একটি সঙেঘ প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার প্রচার করেন। তাঁরা ছটা মাসিক পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন—পারথেনন (১৮৩০), ইষ্ট ইন্ডিয়া (১৮৩১), এনকোয়েরার (১৮৩১-৩৪), জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১-৪০), হিন্দু পায়োনির (১৮৩৫-৪০) এবং বেঙ্গল স্পেকটেটর (১৮৪২-৪৩) প্রথম কয়েক বছর তাঁদের আত্র(মণের প্রধান ল(্য ছিল প্রাচীন হিন্দুধর্ম। পরবর্তী সময়ে তাঁরা ঔপনিবেশিক সরকারের ব্যর্থতার দিকগুলো আত্র(মণ করতে আরম্ভ করলেন।

ডিরোজিয়ানরা রামমোহন এবং তাঁর অনুগামীদের মতো আধ্যাত্মিকতা এবং যুক্তি(র দুইয়ের ওপর নির্ভর করতেন না, তাঁদের কাছে যুক্তি(ই একমাত্র অস্ত্র ছিলো। তাঁরা রামমোহন অনুগামীদের 'অর্ধেক-উদার' বা 'হাফ-লিবারেলস' বলতেন। চল্লিশ দশকের শেষদিকে এই বিরোধ আরও স্পষ্ট হয়েছিল যখন ব্রাহ্ম নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিজ্ঞানের প্রবক্ত(া অ(য়কুমার দত্ত শাস্ত্রের অব্যর্থতার প্র্নের কোন জবাব দিতে পারেননি। বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুপ্রাণিত করেছিল রামমোহনের আধ্যাত্মিকতাবাদ এবং তাঁর যুক্তি(বাদ ও বিজ্ঞানবাদ-এর অনুপ্রাণিত হয়েছিল দত্ত। অ(য়কুমার দত্ত ব্রাহ্মবাদকে ঈ(রবাদ-এ পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রত্যাদেশকে সরিয়ে প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বি(ে-ষণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। ১৮৫০ সালে মানবতাবাদী ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহায্যে এই বিরোধ ত্রিকোণ আকার নিল। বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদ দত্তের বৈজ্ঞানিক যুক্তি(বাদের সঙ্গে ভালোভাবেই মিশে গেল কিন্তু উভয়ই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতাবাদের বিরোধীতা করলেন।

ব্রাহ্ম সমাজ থেকে অ(য় কুমার দত্ত বিতাড়িত হওয়ার ফলে এই বিতর্কের অবসান ঘটেছিল। যদি অজ্ঞাবাদী হতেন অ(য় কুমার দত্ত তাহলে ভারতীয় ধর্ম এবং দর্শনের ইতিহাসে এক ধরণের যুক্তি(বাদ, বস্তুবাদ এবং সমালোচনার জোয়ার আনতে পারতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নববুদ্ধিজীবিশ্রেণীর জীবনে ল(ণচিহ্(রূপে ছিল এই মতবাদ। অন্যদিকে বিদ্যাসাগর, যিনি অজ্ঞাবাদী থেকে গেছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন করার প(সোচ্চার হয়েছিলেন এবং অবশেষে ১৮৫৬ সালে বিধবা পুনর্বিবাহ আইন অনুমোদিত হয়েছিল এবং তিনি হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলনের (১৮৫৫-৫৬) অন্যতম পথিকৃৎ হয়ে রইলেন। তিনি ৬০-এর দশকে হিন্দু কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ-এর বি(দ্ধে সোচ্চার আন্দোলন করেছিলেন। এই ব্যাপারে এবং স্ত্রী-শি(া প্রসারের (ত্রে তাঁর উদ্যোগ শুধুমাত্র র(ণশীল প্রতিক্রি(য়ার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, ঔপনিবেশিক সরকারও সাহায্য করা থেকে প্রতিহত থাকেন। ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীরা, অ(য়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর যে নাস্তিক্যবাদ-অজ্ঞাবাদ-নিরী(শ্বরবাদ-এর ধারা প্রবর্তন করেন তা শেষ সীমায় পৌঁছোয় দৃষ্টবাদী কৃষ(কমল ভট্টাচার্যের (১৮৪০-১৯৩২) কাছে এসে, যিনি নিরী(শ্বরবাদ প্রচার করেন। ঐতিহাসিকভাবে, এই বিকাশ খুবই গু(ত্বপূর্ণ, কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর নাস্তিক চিন্তক জয়রাশি ভট্ট-র অনেক পরে, এই নিরী(শ্বরবাদী চিন্তাবিদ্‌রা ভারতীয় বস্তুবাদ-এর ধারাকে আবার ফিরিয়ে আনে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতদের জন্য, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট চার্চের কিছু প্রচারকদের, জন্য এবং রামমোহন রায় ও তাঁর বিরোধীদের জন্য বিদ্যাসাগর ও অ(য়কুমার দত্ত আধুনিক বাংলা গদ্য রচনা করেন। প্যারী চাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে গদ্যগুলো উদ্ভাসিত হচ্ছিল। ডিরোজিও মত দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রথাবিরোধী মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর লিখিত কাব্য এবং নাট্যে প্রথা ভেঙে সূত্রপাত ঘটালেন অমিত্রা(র ছন্দ, সনেট, ব্যক্তি(বাদ, জাগতিকতা, দেশাত্মবোধ, নারী চরিত্রের স্পষ্টতা এবং নাটকে তী(বিরোধ। এক ঝাঁক নিম্নমানের নাট্যকার এবং কবি তাঁকে সরাসরি অনুসরণ করতে আরম্ভ করলেন। সাহিত্য ছাড়াও, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং দর্শনের চর্চাও করেছিলেন মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০-৫৬) (যিনি প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন), মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪), জগদীশ চন্দ্র বোস (১৮৫৮-১৯৩৭), প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) এবং কৃষ(কমল ভট্টাচার্যের মত পন্ডিতেরা। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) ইসলাম সংক্র(ান্ত পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেন এবং ইসলামধর্মের নানা দিক নিয়ে অনেক বই এবং জীবনীমূলক গ্রন্থ লেখেন। বাংলায় প্রথম তিনি তাঁর সারাজীবন উৎসর্গ করেছিলেন কোরান-এর অনুবাদ করতে গিয়ে (১৮৮৬)। অ(য় কুমার দত্ত নবজাগরণের আর একটা ধারা প্রবর্তন করেন। ফ্রান্সের আলোকপ্রাপ্ত অনেক দার্শনিকদের মত, তিনি এবং বাংলা নবজাগরণের আরো অনেক বুদ্ধিজীবি বেশিরভাগ (ত্রে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোনিবেশ না করে বিভিন্ন (ত্রে তাঁরা নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন, শখের উদ্ভাবক। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্ত সংগ্রহ (১৮৫০) এবং রহস্য সন্দর্ভ (১৮৬০) এবং বঙ্কিমচন্দ্রর বঙ্গদর্শন (১৮৭০) আরো অনেকের লেখার মত এই নিদর্শন বহন করে।

ঊনিশ শতকের পুরো ছটা দশক জুড়ে বিরাজ করছিল বাংলার নবজাগরণ যখন যুক্তি(বাদ ছিল সমাজ পরিচালক নীতি যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংস্কার এবং সংস্কারকদের আত্র(মণের স্বাভাবিক ল(্য ছিল হিন্দুত্ববাদের কিছু ধারার প্রতি। শেষ চার দশক জুড়ে ছিল জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ গোটা বাংলা, যার উদ্দেশ্য ছিল পুনঃর্জাগরণ এবং তাদের আত্র(মণের ল(্য ছিল ভারতে অবস্থানরত ব্রিটিশ উপনিবেশ। বিদেশীদের আয়ত্বাধীন দেশের পরিস্থিতি যুক্তি(বাদীদের বেশিদিন বিমুখ হয়ে থাকতে দেয়নি। 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' বা 'কালো আইন' (সাদা চামড়ার প্রতিবাদীদের বি(দ্ধে কোন ভারতীয় বিচারক রায় দিতে পারবেন না এই বর্ণবৈষম্যের বি(দ্ধে প্রবর্তিত আইন) বিতর্ক, ১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহ, এবং নীলচাষ বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০) গুলোর কিছু অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বাঙালী চিন্তকদের জাতীয়তাবাদী পথে

নিয়ে আসার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছিল। ষাটের দশকে এই ধারণা অনেক মনীষিদের মনে কল্পনা জাগিয়েছিল এবং অনেক ব্রাহ্ম ব্যক্তি(ত্ব যেমন নবগোপাল মিত্র (১৮৪১-৯৪), রাজনারায়ণ বোস (১৮২৬-৯৯), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর সন্তানেরা (১৮৬৭-৮১) সাল পর্যন্ত 'হিন্দু মেলা' এবং ১৮৭২ সালে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এক আলোচনা সভার মাধ্যমে 'হিন্দু' জাতীয়তাবাদী ধারণাকে আরও স্পষ্ট করে তোলেন।

এই উদ্যোগ 'নয়া-হিন্দুত্ববাদ' নামক একটি বৌদ্ধিক আন্দোলনের সূচনা করেছিল যা হিন্দু শাস্ত্র এবং একই সঙ্গে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্রশংসিত সমালোচনার সাহায্যে হিন্দুত্ববাদকে পুনরায় রূপান্তর ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। নয়া-হিন্দুত্ববাদের প্রবর্তকেরা ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ব্রাহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭)। ব্রাহ্ম ধর্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্মের একে(রবাদ-এর প্রত্যুত্তরে নয়া হিন্দু ভাববাদীরা সর্বে(রবাদের কথা বলেছেন। তাঁরা শি(া, সামাজিক কাজকর্ম, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ত্রি(য়াকলাপ, এবং একই সঙ্গে বোধের অনুশীলন-এর মাধ্যমে সংস্করণ, সংস্কারসাধন উন্নতি প্রভৃতির সমাজ সংস্কারের ধারণাগুলি উত্থিত হবে বলে মনে করতেন। তাঁরা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধকেই আহ্বান করেছিলেন এবং মাতৃভূমিকে দেবী হিসেবে পূজা করতেন। ইন্ডিয়া লিগ (১৮৫৭), ইন্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশন, (১৮৭৬), ন্যাশনাল কনফারেন্স (১৮৮৩), এবং দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (১৮৮৫)-এর মত কিছু সংগঠন-এর মাধ্যমে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আরো বেশি যুক্তি(বাদী অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে মোড় নেয়।

নয়া হিন্দু এবং জাতীয়তাবাদের অনুভূতির জন্য কিন্তু নবজাগরণের উৎসাহ-উদ্দীপনা একেবারে নিস্পৃহ হয়ে যায়নি। দিলাওয়ার হোসেইন (১৮৪০-১৯১৩) যিনি মুসলমানদের আর্থসামাজিক অসুবিধাগুলো যুক্তি(বাদী চিন্তার দ্বারা তুলে ধরেছিলেন সমাজে। মির মোশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), একজন ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং সমাজ সমালোচক এবং রোকিয়া শাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩১), লেখিকা, শি(াবিদ, মুসলমান নারীদের শৃঙ্খল মোচনে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন—এঁদের কাছে নবজাগরণ তার জমি নতুনভাবে খুঁজে পেয়েছিল। আর শতাব্দীর শেষ সীমায় এই নবজীবনের তেজ ছড়িয়ে পড়েছিল উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

অনেক উত্তর আধুনিক পন্ডিতদের মতে, বাংলার 'নবজাগরণ' শব্দটি ভ্রান্তিমূলক এই অর্থে যে এটা একটা প্রবঞ্চনা যার দ্বারা ঔপনিবেশিক সরকার-এর প্রশাসন এবং শি(া-দফর খুব সচেতনভাবেই একটা শ্রেণী তৈরী করেছিল যা আমরা উনিশ শতকে দেখতে পাই। এই শ্রেণী ছিল খুব (ুদ্র এবং উচ্চবর্ণের শহুরে হিন্দুদের একাংশের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ ছিল যাদের ভাবনা চিন্তা ও ত্রি(য়াকলাপ বাংলা সমাজে খুব কম অথবা একেবারেই কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। মুসলমান সমাজ এবং গ্রামীণ হিন্দু সমাজেও এর কোন প্রভাব পড়েনি।

বাংলা ছাড়াও, এমন কিছু রাজ্যেও, এই জাগরণের চিহ্(ও প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায় প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ এবং থিওজফিকাল সোসাইটি নামক প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

১০.২ প্রার্থনা সমাজ

ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে ১৮৬৭ সালে মহারাষ্ট্রে স্থাপিত হয় প্রার্থনা সমাজ। আত্মারাম পান্ডুরাঙ এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮৪০ সালে বম্বেতে পরমহংস মন্ডলী স্থাপনের মধ্যে দিয়ে প্রতিমা উপাসনা এবং জাত-পাত প্রথার বি(দ্ধে সামাজিক এবং ধর্মীয় আন্দোলনগুলি শু(হয়েছিল মহারাষ্ট্রে। পশ্চিম ভারতের সবথেকে প্রথম ধর্মীয় সংস্কারক ছিলেন গোপালহরি দেশমুখ যিনি হিন্দু র(ণশীলতাকে আত্র(মণ করেছিলেন এবং সমাজের সমতার কথা প্রচার করেছিলেন।

পরবর্তীকালে প্রার্থনা সমাজে একেশ্বরবাদের প্রচার করে এবং ধর্মকে জাতপাতের র(ণশীলতা এবং পুরোহিতদের দমনরীতির বেড়াজাল থেকে মুক্ত(করার চেষ্টা করেছিল। আধুনিক শি(ার আলোতে হিন্দুত্ববাদকে সংস্কার করার তাদের ল(্য ছিল। এর প্রধান দুই নেতা ছিলেন ঐতিহাসিক আর. জি. ভান্ডারকর, এবং এ. জি. রাণাডে। এই আন্দোলন মহিলাদের ওপর অত্যাচার, মাদকতা, অস্পৃশ্যতা এবং বিভিন্ন সামাজিক অন্যায়ের বি(দ্ধে এক শক্তি(শালী কর্মসভার আয়োজন করেছিল।

১০.৩ আর্য সমাজ

উত্তর ভারতে আর্য সমাজকে কেন্দ্র করে হিন্দু সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৮৭৫ সালে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠা করেন আর্য সমাজ। দয়ানন্দ বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে পুরাণের (তিপূর্ণ দিকগুলো থেকে হিন্দু ধর্মকে মুক্ত(করে তাকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। তিনি সমস্ত জ্ঞানের ঊর্ধ্বে বৈদিক শাস্ত্রকে রেখেছিলেন। দয়ানন্দ বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি(ই ভগবানের দ্বারে সরাসরি প্রবেশের অধিকার আছে। তাঁর আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল হিন্দু র(ণশীলতার বি(দ্ধে। যদিও বেদের অভ্রান্ততার প্রতি বিশ্বাসই প্রধান ছিল, তবু দয়ানন্দের আন্দোলন অন্যান্য সমাজ সংস্কারকের মতই ছিল। তিনি পশ্চিমী বিজ্ঞানের শি(ার জন্য প্রচার করেছিলেন এবং প্রতিমা-পূজো এবং হিন্দুত্ববাদের আচার-আচরণরীতির বিরোধিতা করেছিলেন। দয়ানন্দ বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র এবং অন্যান্য সমাজসংস্কারকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। পরবর্তী সময়ে আর্যসমাজের কিছু কর্মীদের উদ্যোগে আধুনিক শি(া বিস্তারের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। এখানে এটা দ্রষ্টব্য যে আর্য সমাজ বুঝতে পারেনি যে ভারতের জাতীয় একতা সমস্ত ধর্মের, জাতের বিশ্বাসের মানুষকে একত্রিত করার জন্য সব ধর্মের ঊর্ধ্বে থেকে মানুষের হয়ে প্রচার করতে হত।

১০.৪ থিওজফিকাল সোসাইটি

মাদাম এইচ. পি. বাভাৎস্কি এবং কলোনেল এইচ. এস. অলকট ইউ. এস. এ-তে ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন থিওজফিকাল সোসাইটি। ১৮৮৬ সালে এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় মাদ্রাজের কাছে। এই সমাজ হিন্দুধর্ম, জোরাসট্রিয়ানিজম, এবং বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন ধর্মগুলি আবার ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচার করেছিল। এই আন্দোলন ভারতবর্ষে আরও শক্তি(শালী করে তুলেছিল শ্রীমতী অ্যানিবেসান্ত যিনি ভারতে এসেছিলেন ১৮৯৩ সালে। ফিওজফিস্টরা বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ববোধের কথা প্রচার করেছিলেন। এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রাচ্যবিদরা যাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যকে সম্মান এবং প্রশংসা করতেন। ধর্মীয় পুনর্জাগরণের (ত্রে থিওজফিস্টরা সফল হতে পারেননি। মদনমোহন মালব্যের উদ্যোগে শ্রীমতি অ্যানিবেসান্ত বেনারসে প্রতিষ্ঠা করেন কেন্দ্রীয় হিন্দু বিদ্যালয় যা পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়।

১০.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. এ. সি. ব্যানার্জ্জি—দি নিউ হিস্ট্রি অফ মডার্ন ইন্ডিয়া

২. এন. এস. বোস—দি ইন্ডিয়ান অ্যাওয়েকেনিং অ্যান্ড বেঙ্গল
৩, ডেফিড কপ্‌ফ—ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজম অ্যান্ড দি বেঙ্গল রণেশাঁস
৪. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতণু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ।
৫. বিনয় ঘোষ—বাংলার নবজাগৃতি।
৬. এ পোদ্দার—বেঙ্গল রনেশাঁস।
৭. এম. এন. ফানকুহার—মডার্ন রিলিজিয়াস মুভমেন্টস।

১০.৬ অনুশীলনী

১. ভারতে ইংরেজী শি(ার প্রসারের কথা আলোচনা কর।
২. রাজা রামমোহন রায়, ইয়ং বেঙ্গল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা নবজাগরণে অবদানের কথা আলোচনা কর।
৩. সং(েপে প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ এবং থিওজফিকাল আন্দোলন সম্পর্কে লেখ।

একক ১১ ❑ ১৮৫৭ সালের পর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুনর্গঠন

গঠন

১১.০ ১৮৫৭ সালের ওপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুনর্গঠন
১১.১ গ্রন্থপঞ্জি
১১.২ অনুশীলনী

১১.০ ১৮৫৭ সালের পর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুনর্গঠন

বিদ্রোহের পর এসেছিল পুনঃর্গঠন। কর্মপন্থার প্রথমেই ছিল ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপসাধন করা। ১৮৫৮ সালের সরকারের ভারত আইন বঞ্চিত করেছিল ভারত সরকারের কোম্পানীকে। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতির জায়গা নিয়েছিলেন ভারতের জন্য যে রাষ্ট্রসচিব তিনি, যিনি হয়ে উঠেছিলেন, ক্যাবিনেটের অধীনে কর্তৃত্বের মূল কেন্দ্র, আরও ভালো ভাবে বললে ভারতবর্ষে নীতির পরিচালক। স্থানীয় জ্ঞান যোগানোর (ে ত্রে যেখানে পরিচালকগণ কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করতে অনুমতি দেওয়ার কথা দাবী করেছিলেন। এটি ছিল ১৫ জন সদস্য সমৃদ্ধ, এঁদের মধ্যে ৮ জন সদস্য নিযুক্ত(হয়েছিলেন রাজার বা রাজতন্ত্রের দ্বারা, এবং বাকি ৭ জন প্রথমে পরিচালকদের দ্বারা এবং পরে কাউন্সিলের নিজের সভ্যদের ভোট দ্বারাই সভ্য নির্বাচন হওয়া। এই কাউন্সিলের ঝোঁক ছিল সরকারী অভিজ্ঞতা প্রদর্শনের এবং দেখা যাচ্ছে সভ্যরা ছিলেন সাধারণতঃ তারা, ভারতবর্ষে গোটা কর্মজীবনের সমস্ত অংশ কাটানোর পর যাঁরা অবসরপ্রাপ্ত হতেন। রূপায়িত করেছিলেন সরকারী অভিজ্ঞতা অতীত প্রজন্মের। এটি হয়তো চিহ্নি(ত করা যায় যে, ১৮৫৮ সালের আইনে, ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল পরিচিত হলেন ভাইসরয় অব ইন্ডিয়া হিসেবে এবং তিনি কার্য করেছিলেন ভারত সচিব এবং তাঁর কাউন্সিলের নির্দেশে।

ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, রাজতন্ত্র নিঃসন্দেহে কোম্পানীর তুলনায় কম ব্যাক্তি(ত্ব সম্পন্ন ছিল এবং ঐ মুহূর্তে ভারতবর্ষ ছিল চলতে থাকা মনোযোগের বিষয় লন্ডন পরিচালক সমিতি বা চত্রে(র কাছে। রাজতন্ত্র নিজেই, ব্যক্তি(গতভাবে রাণী ভিক্টোরিয়া ভারত বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং সেই মতো তাঁর স্বার্থকে পরিচালিত করেছিলেন একইভাবে তাঁর পৌর এবং সামরিক কর্মচারীদের (ে ত্রে এবং বৃহৎ অর্থে বা মুক্ত(অর্থে ভারতবর্ষের জনগণের (ে ত্রে।

'Indian Services'-এর ঘনিষ্ঠ বর্ণ চত্রে(র মধ্যে আবর্তিত হওয়ার ঝোঁককে ঐ পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে বাধা দিয়েছিল। ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে দিয়ে পাওয়া উদ্যোগ ও স্বাতন্ত্র সে হারিয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে যেমন এই সার্বিক স্থানান্তর, আমরা একমত হতে পারি যে, পরিবর্তন জড়িয়ে গিয়েছিল অনিয়মিত এবং ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তি(গত (তির অনুভব থেকে, যা একঘেয়ে ভাবে আবেষ্টন করেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া হাউসকে। কিন্তু এটি ছিল (তিপূরণের থেকে অনেকবেশী যা অনেকবেশী অগ্রবর্তী তার দ্বারা যা ব্যাপ্ত করেছিল নব্য ভারত কার্যালয়। বাণিজ্যতন্ত্রের অবশিষ্টাংশ বা ধ্বংসাবশেষ এবং 'ledger-book attitude' মনোভাব যা কিনা পরিচালকগণ দৃঢ়ভাবে আটকে রেখেছিলেন, চিরকালের জন্য সম্পূর্ণ মুছে যাওয়া পর্যন্ত। এই ধরনের গৃহ কাতরতার প্রতি ঝোঁক যার মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় সরকার যেমন অনেক বেশী পুলিশের কার্য এবং রাজস্ব সংগ্রহে সেই সঙ্গে বিতৃষ(া সহকারে প্রবৃত্ত হয়েছিল নতুন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ওপর, একই সঙ্গে যা আবার মুছে গিয়েছিল একান্তে। সার্বিকভাবে সরকার তখন সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকাচ্ছিল আধুনিক ভারতের দিকে, অনেচেতনভাবে ফিরে যায়নি মুঘল প্রশান্তির দিকে।

যেমন এর ফলে, বলা যেতে পারে, ব্রিটিশ ত্যাগ করেছিল তাদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি। বিদ্রোহের সময়ে বেশীরভাগ উচ্চপদস্থ জনেরাই ছিলেন ব্রিটিশ শক্তি(র কাছে অনুগত, যেমন লর্ড ক্যানিং তার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন ''breaknaters in storm'' আখ্যায়। ব্রিটিশ রাণীর নামাঙ্কিত ঘোষণাপত্র দ্বারা তাঁরা এইসময় পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ঐ সময় থেকে ব্রিটিশ অনুসরন করতে থাকে স্থিতাবস্থার নীতি যতদূর সম্ভব সং(-ষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে। নানারকম উপাধি পেনসন, এবং তোপ দেগে অভিবাদন জানানোর মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ এদের চেষ্টা করেছিল স্বপ(ে আনতে এগুলি ছিল ব্রিটিশকৃত সম্মানের স্মারক চিহ্(। নতুন নীতির মধ্যে প্রথম বাধা ছিল রাজতন্ত্রের দ্বারা সার্বভৌমিকতার ধারনার। সমস্ত রাজ্যগুলি এই সময় হয়ে উঠেছিল রাজকীয় শ্রেষ্ঠতার মনোযোগের বিষয় যেমন মুঘল যুগে দেখা যেত। এই সংযোজক বিষয়টি ছিল আরও নিশ্চিত এবং আরও ব্যক্তি(গত, কোম্পানীর নৈব্যক্তি(ক অস্পষ্ট কর্তৃত্বের তুলনায়। এই পদ(ে পে দুটি প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত(ছিল। প্রথমত, সাম্রাজ্যের অখন্ড অংশ হিসেবে বরং উপে(ার থেকেও বেশী লালিত হয়েছিল বিলোপসাধনের ঝোঁকের সঙ্গে। তাদের সীমানাগুলি ছিল নিশ্চিত এবং গ্রহণ করার বা অধিকার করার দাবী বাতিল হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ হস্ত(ে পের অধিকারের সঙ্গে রাজকীয় শ্রেষ্ঠতার ধারনা বাহির হয়েছিল। উচ্চপদের বা রাজতন্ত্রের লালনকারীরা এইভাবে জোর দিয়েছিল ভালো ব্যবহারের ওপরে যে কোম্পানী এর সঙ্গে অবজ্ঞার দূরত্ব রাখতে পারেনি। ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির প্রভাব এই সময় অত্যন্ত কার্যকরীভাবে ব্যাবহৃত হয়েছিল সুস্থ সরকার গড়ে তুলতে। রাজোচিত দুর্নীতিপূর্ণ প্রশাসন হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যের উদ্বেগের বিষয় এবং তারা উৎসাহিত হয়েছিল নিজেদের স্বার্থে তাদের চারপাশে যে কাজের বাতাবরণ ছিল এবং নি(ি প্ত করেছিল তাদের অবস্থান বা রাষ্ট্রকে। এই ধরনের পদ(ে পের দ্বারা খোলাখুলিভাবে পশ্চিমী প্রভাব গ্রহণ করতে, যেমন রাস্তা তৈরী এবং রেলওয়ে এবং সেইসঙ্গে শি(ার বিস্তার এবং আধুনিক শিল্প তৈরীর (ে ত্রে। সুতরাং স্বরতন্ত্র কিছু রাজার একত্রীকরনের মধ্যে থেকে রাজারা পরিণত হয়েছিল একটি নতুন রাজ্য গঠনের বাধা হিসেবে।

১৮৫৩ সালের আইন পরিষদের প্রকৃত অর্থেই রূপান্তর ঘটেছিল। নতুন বিচারক এবং চারজন প্রাদেশিক প্রতিনিধিরাজ পুনঃস্থাপিত হয়েছিল গভর্নর জেনারেলের দ্বারা অতিরিক্ত(সদস্যের দ্বারা। অন্ততঃ এদের মধ্যে $\frac{1}{2}$ সরকারী কর্মচারী ছিলেন না। তাদের নির্বাচনের জন্য কোনও আইন নির্দেশিত ছিল না। কিন্তু কার্য(ে ত্রে ডালহৌসীর আকাঙ(া ছিল ভারতীয় প্রতিনিধিত্বকে নিশ্চিত করা, যা এইভাবে সাফল্যলাভ করেছিল। একই সময়ে পরিষদের (মতা, যা ক্যানিং সন্ধান পেয়েছিলেন অসুবিধাজনক অর্থে স্বাধীন। যা বদ্ধ ছিল পরিমাণের বিচার-বিবেচনার (ে ত্রে, নির্দিষ্ট অর্থে যা নিহিত ছিল তাদের আগে। এইভাবে আশা করা হয়েছিল, সর্বোচ্চ সরকার জনগনের থেকে তার বিচ্ছিন্নতাকে কমিয়ে আনবে, যেখানে সরানো হচ্ছে একটি কৃত্রিম সংসদ সংত্র(ান্ত বিরোধীতা বিচারকদের এবং প্রাদেশিক কর্মচারীদের আচরনে। একই সময়ে আইনপ্রনয়ণের (মতা বিশিষ্ট শক্তি(পুনঃস্থাপিত হয়েছিল বোম্বে এবং মাদ্রাজে প্রাদেশিক কাজকর্মের জন্য।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় থেকে প্রশাসনিক পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল দাম্ভিক আর দিনের পর দিন বাড়তে থাকা আমলাতান্ত্রিক চরিত্রের একটি ব্যবস্থা। এই পদ্ধতি ছিল অবিচ্ছিন্ন এবং নিরেট বা জমাটবদ্ধ ১৮৫৮-র পর, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস—আমলাতান্ত্রিকতার মূল সুর হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের ইস্পাত নির্মিত গঠন।'' ১৮৫৮-র ভারত সরকারের আইন (মতা প্রদান করেছিল নিয়মবিধি তৈরী করতে কাউন্সিলের রাষ্ট্রসচিবকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যারা প্রবেশ করবে তাদের জন্যে, মুক্ত(প্রতিযোগিতামূলক পরী(ার ভিত্তিতে, যা হবে লন্ডনের সিভিল সার্ভিস কমিশনের দ্বারা। পুনঃস্থাপনের পুরনো পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে প্রার্থীরা কোম্পানীর পরিচালকদের দ্বারা মনোনীত হবেন। ১৮৫৮ সালের আইন অনুসারে সমস্ত স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেওয়া সাম্রাজ্যের বিষয়গুলি পরী(ায় বসার জন্য যোগ্য। যাদের ছিল বয়সের সীমা এবং শি(াগত যোগ্যতা বিষয়ক নির্দেশ। প্রার্থীদের সুপারিশ করা হয়েছিল সিভিল সার্ভিস

কমিশনারদের দ্বারা, তাদের যোগ্যতার ত্র(ম অনুসারে, তারা মনোনীত হয়েছিল শূন্যপদ পূরণ করতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের, পরিষদের রাষ্ট্র সচিবের দ্বারা। ১৮৬১ সালের ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আইন, সংসদের দ্বারা পাস হয়েছিল, সংর(িত ছিল নিশ্চিতভাবে কয়েকটি শ্রেণীর উচ্চপদস্থ পরিচালক এবং বিচার বিভাগীয় পদ, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য। এই আইনের একটি গু(ত্বপূর্ণ ছবি ছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ আইনের শর্ত বাতিল, যুক্ত(হয়েছে সিভিল বা পৌর কর্মচারীদের উন্নত জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে। এটি বঞ্চিত করেছিল ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভবিষ্যৎ ভারতীয় সদস্যদের, প্রাচীনত্বের ভিত্তিতে পদন্নোতির দাবীকে। প্রথম ভারতীয় যিনি লন্ডনে প্রতিযোগিতামূলক I.C.S পরী(ায় পাস করেছিলেন, তিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই। ১৮৬১ সালে তিনজন সফল ভারতীয় সদস্যরা হলেন— সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্ত। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে ১৮৫৮ সালের পর তিনদশকের জন্য, সেখানে শু(হয়েছিল একটানা বিতর্ক, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের বয়স নিয়ে, এবং ১৮৯২ এর মধ্যে সর্বনিম্ন বয়সের সীমা বাড়িয়ে ২১ এবং সর্বাধিক ২৩-এ আনা হয়েছিল।

পরবর্তী বিষয় ছিল অর্থ সংত্র(ান্ত ব্যাপারের পুনঃগর্ঠন। ভারত সরকারের মূলধনের যোগান ছিল অদ্যাবধী যৌথভাবে এবং তাঁর পরিষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বিদ্রোহ, রাজস্বের কিছু উৎস বাতিল করে এবং নতুন ব্যয় অরোপ করে। যা যুক্ত(করেছিল ৪২ মিলিয়ন পাউন্ড ভারতীয় ঋণের সঙ্গে, যা যোগ করলে দাড়ায় ৯৮ মিলিয়ন পাউন্ড। বস্তুত, ভারত এই সময় দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল মুঘল আমলের পুরনো স্বয়ংত্রি(য় গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে দিয়ে বি(্ব অর্থনৈতিক গতির ক(পথে। পুরনো শাসনের তুলনায় নতুন কিছু জিনিসের প্রয়োজন ছিল এবং ভাইসরয়ের পরিষদে নতুন পদ পূরণ হয়েছিল ১৮৫৯ সালে রাজস্বাধ্য(জেমস উইলসনের মনোনয়ন দ্বারা। তিনি অর্থকরী প্রশাসনের (েত্রে সমস্ত পদ্ধতিটাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন, গু(ত্বপূর্ণ অর্থনীতির একটি নকশা তৈরী করেন, পাঁচ বছরের জন্য আয়কর আরোপ করেন, এবং অন্তর্ভুক্ত(করেন সরকারী আয়ব্যায়ের আগাম হিসেবের অভ্যেস এবং হিসেবের বিবৃতি দান। তাঁর কাজ, সমাপ্ত হয়েছিল তাঁর উত্তরাধীকার স্যামুয়েল লেইঙ এর দ্বারা (Laing) যিনি শতকরা ১০ ভাগ সমরূপ রাজস্ব অন্তর্ভুক্ত(করেছিলেন। একটি ভাঙানো যায় এমন ধরনের কাগজের নোট, এবং যুক্ত(করেছিলেন লবণ কর। উইলসন এবং লাইঙ-এর কাজ চিহ্নি(ত করছে আধুনিক ভারতীয় মূলধনের সূচনাকে, এবং এভাবেই বার্ষিক ঘাটতি অদৃশ্য হয়েছিল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে।

মনোযোগের পরবর্তী বিষয় ছিল ভূমি। বস্তুত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়েছিল একইসঙ্গে ভূমির অনুপার্জিত বৃদ্ধি এবং জমিদারদের কৃষির বৃদ্ধি যা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়েছিল বাংলার ভাড়া আইনের সঙ্গে। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, এই আইন ছিল সম্পূর্ণ সাফল্য থেকে অনেক দূরবর্তী এবং প্ররোচনা দিয়েছিল প্রচুর মামলা মোকদ্দমার, কিন্তু যদি এটা খুব বেশী ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে এটি যেন একটি কৃষকদের মহাসনদ (Magnacarta) অন্ততঃ এটি প্রমাণ করেছিল একটি বিরাট ঘটনা, বড় জমিদার এবং তালুকদারদের মর্জি বা খামখেয়ালী মনোভাবের থেকে কৃষকদের র(ার চেষ্টা করা।

সামরিক পুনর্গঠনের প্রথম সমস্যা ছিল Company-র ইউরোপীয় সেনাদলের আদৃষ্ট বা নিয়তি। সঙ্গে Company-র শাসন চলাকালীন তারা স্বয়ংত্রি(য় ভাবেই রাজতন্ত্রের অধীনে ছিল। তাদের প্রয়োজন ছিল না ওই কারণের জন্য ভেঙে যাওয়া এবং ক্যানিং আকাঙ(া করেছিলেন স্থানীয় ইউরোপীয় সেনা দলের অবশিষ্টাংশকে ধরে রাখতে। কিন্তু তিনি home government-এর ধারা বেশি পরিচালিত হয়েছিলেন। যা সিদ্ধান্ত করেছিল সম্পূর্ণ মিশ্রনের ওপর, এবং নতুন শর্তে সমস্ত পদের জন্য চাকরি প্রদান করা হয়েছিল। নতুন নীতির ওপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় অংশটি পুর্নগঠিত হয়েছিল। বিদ্রোহের আগে সেখানে, অর্থাৎ তিনটি প্রদেশে। ২ ল(৩৮ হাজার ভারতীয় সেনাদল থেকে ৪৫ হাজার Europeans ছিল। ভারতীয় থেকে ইউরোপীয় অনুপাত এই সময় ধার্য হয়েছিল অর্ধেক অনুপাতে বাংলার সেনাদলে(এবং অন্য

দুটির (ে ত্রে ২ ১ অনুপাতে। যখন ১৮৬৩ সালে পুনর্গঠন সম্পূর্ণ হয়েছিল, তখন ভারতীয় সেনাদের সংখ্যা ছিল ১ ল(৪০ হাজার এবং ইউরোপীয়দের ৬৫ হাজার। সতর্কীকরণের চেতনা বা সাবধানতা আবার দেখা গিয়েছিল ভারতীয় গোলন্দাজ সৈন্য বিভাগে ভেঙে যাওয়ার দ্বারা যা প্রমাণ করেছিল সেই ভয়ানক অবস্থা যা বিদ্রোহীদের হাতে ঘটেছিল। সেখানে কিছু লোক ছিলেন যাঁরা ১৮ শতকে ব্যবহৃত সৈন্যদলের মিশ্র পদ্ধতিতে ফিরে আসার কথা সপ(ওকালতি করেছেন, যদ্বারা প্রত্যেক সৈন্যদল ভর্তি ছিল সমস্ত শ্রেণীর মানুষ দ্বারা। কিন্তু, না ঐতিহ্যের চেতনা, না ভবিষ্যৎ বত্ত(া উৎসাহিত হয়েছিল, পরিবর্তে সৈন্যদলের শ্রেণী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং অন্তিম অবস্থার জন্য পড়েছিল বাকি সময়কাল। দুটি ভারতীয় পদাতিক সেনাদলের অংশ বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল। সঙ্গে একটি ইউরোপীয় পরিপূরক সেনাদল ছিল। যেমন, ভারতীয় সেনাদল পূর্বে পরিচালিত হত ইউরোপীয়দের দ্বারা। একটি পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছিল শ্রেণী অনুপাতের নিযুক্তি(তে। বহু সংখ্যক যুক্ত(প্রদেশ থেকে আসা রাজপুত এবং ব্রাহ্মণরা হ্রাস পেয়েছিল অন্যদিকে সেনাদলে গুরখা, শিখ এবং পাঞ্জাবিরা বেড়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের শেষে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান হয়েছিল। যেমন British-রা ত্র(মাগত দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে আরও বেশি জাতি বিদ্বেশি মনোভাব নিয়েছিল। ভারতীয়দের বি(দ্ধে ইংরেজ জাতিভেদের নীতি অনুসরন করেছিল। ইংরেজ শাসক এই সময় প্রবৃত্ত হয়েছিল দমন ও সুবিধাদানের মতো নীতির দ্বৈত প্রয়োগে। তারা তৈরী করতে চাইছিল এমন একটা বি(্বাস যে সরকারের মূল উদ্দেশ্য হল জনকল্যানের ধারনাকে বর্ধিত করা। এই সুবিধাদানের নীতি প্রতিফলিত হয়েছিল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে Indian Council Act-এর মতো আইন পাশের মাধ্যমে। যা বর্ধিত করেছিল ভাইসরয়ের Council-কে কিছু সংখ্যক মনোনীতি ভারতীয় সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি(র দ্বারা। কলেজ ও বি(্বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন সহজ করে তুলেছিল শি(ার প্রসার, দন্ড-সংহিতার ভূমিকা, অপরাধের কার্যপ্রণালীর সংহিতা, ইত্যাদি। ওই দশকগুলি যা বিদ্রোহগুলিকে অনুসরন করেছিল এবং জাতীয় সচেতনতার বৃদ্ধি প্রত্য(করেছিল। জাতীয় প্রতিত্রি(য়া তি্র বর্শার ফলার মতো হয়ে উঠেছিল শি(ত মধ্যবিত্তের দ্বারা। এই পদ(প এখন নির্ভর করেছিল ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে এবং তাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকা ইংরেজ শাসকশ্রেণীর মনে বিপদ সংকেতের কারণ ছিল। এই বিপদ সংকেতই তাদের চালিত করেছিল devide & rule-এর মতো নীতি অনুসরন করতে। উচ্চপদস্থ লোকদের ঘুরিয়ে দেওয়া জনসাধারনের বি(দ্ধে, প্রদেশের বি(দ্ধে প্রদেশ এবং সর্বোপরি হিন্দুর বি(দ্ধে মুসলমানদের। বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান একতা অসুবিধায় ফেলেছিল বিদেশীদের এবং তারা এখন দ(ভাবে মনস্থ করল এই একতা ভাঙতে হবে সুতরাং এই ভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করার জন্য।

১১.১ গ্রন্থপঞ্জি

১. এ. সি. ব্যানার্জী—দি নিউ হিস্ট্রি অফ মডার্ন ইন্ডিয়া

২. ভি. এ. স্মিথ (সম্পাদিত—পি. স্পীয়ার)—দি অক্সফোর্ড হিস্টরি অব ইন্ডিয়া

৩. সুমিত সরকার—মর্ডান ইন্ডিয়া

৪. বিপান চন্দ্র—মর্ডান ইন্ডিয়া

১১.২ অনুশীলনী

১. সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শক্তি(কিভাবে ভূমি, অর্থসংক্র(ান্ত, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস সংক্র(ান্ত বিষয়গুলিকে পুনর্গঠন করেছিল?

২. তাদের পুনর্বিন্যাসের প্রথম অসুবিধেগুলি কী ছিল?

৩. সিপাহী বিদ্রোহের ব্রিটিশ প্রশাসনে পরিবর্তনগুলি আলোচনা কর।

৪. দেশীয় রাজ্যগুলিকে কিভাবে ব্রিটিশ শক্তি(নিয়ন্ত্রণ করতো?

একক ১২ ❑ রাষ্ট্র এবং সমাজ সংস্কার

গঠন

১২.০ রাষ্ট্র এবং সমাজ সংস্কার
১২.১ রাজারামমোহন রায় এবং ব্রাহ্ম সমাজ
১২.২ ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন
১২.৩ বিদ্যাসাগর
১২.৪ প্রার্থনা সমাজ
১২.৫ দয়ানন্দ সরস্বতী এবং আর্যসমাজ
১২.৬ শ্রীরামকৃষ(এবং স্বামী বিবেকানন্দ
১২.৭ থিওসফিক্যাল আন্দোলন
১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি
১২.৯ অনুশীলনী

১২.০ রাষ্ট্র এবং সমাজ সংস্কার

উনিশ শতক হচ্ছে অন্যতম উজ্জ্বল সময় ভারতের ইতিহাসে। বস্তুতঃ এটা ছিল সেই কাল যে দেখেছিল আধুনিক ভারতের জন্ম এবং বহু আন্দোলন ও চিন্তার সূচনার সূদূরপ্রসারী ফল বা প্রভাব। এটি একটি অত্যন্ত পরিচিত প্রবাদবাক্য যে গভীর অন্ধকার অগ্রবর্তী আলোকিত উজ্জ্বলতায় পৌঁছায় এবং ১৯ শতকের ভারত এবং ইতিহাসের এই রত্তি(মাভা প্রস্তুত করেছিল একটি উচ্চ ভাবনার উজ্জ্বল উদাহরণ। নৈরাশ্য আর অবসাদের অনুভব দেশকে ছায়ায় আবৃত করেছিল এর মধ্যে দিয়ে ১৮ শতক বাহিত হয়েছিল। এবং উনিশ শতক অগ্রবর্তী হয়েছিল প্রভূত সম্ভাবনার যুগ হিসেবে। দেশ সমৃদ্ধশালী হয়েছিল নতুন প্রাণের বিকাশের দ্বারা। পুনঃর্জন্মের সুস্পষ্ট চিহ্(প্রতিফলিত হয়েছিল এবং গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা স্থান নিতে শু(করেছিল আগ্রহের সঙ্গে জীবনের নানা পরিধির (ে ত্রে। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব জমাট বেঁধেছিল ১৮ থেকে ১৯ শতক সময়ের মধ্যে যা ভারতীয় সমাজ রীতি এবং সংগঠনের অস্পষ্টতাকেই প্রতিফলিত করেছিল। ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে, একটি নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বৃদ্ধি ঘটেছিল, যা পান করেছিল উদারনৈতিকপশ্চিমী সংস্কৃতি, এবং স্বীকার করেছিল নতুন আন্দোলন গড়ার প্রয়োজনীয়তা কারণ অতীত থেকে পাওয়া ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামাজিক সংগঠনের সংস্কারের জন্য। এটি হবে না সত্যের কোনও হাস্যকর অনুকরণ নিশ্চয় করে বলা যে ১৯ শতকের প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিকআন্দোলন যা বাংলা থেকে নির্গত হয়েছিল। এবং মধ্য শ্রেণীর বাঙালী বুদ্ধিজীবী ছিলেন এই জাগরণের পুরোভাগে।

১২.১ রাজা রামমোহন রায় এবং ব্রাহ্মসমাজ

রাজা রামমোহন রায়কে বলা যায় প্রথমে ভারতীয় যিনি চেষ্টা করেছিলেন ভারতীয় সমাজকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে টেনে বের করতে। তিনি সূচনা করেছিলেন নতুন ভাবনার যা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বৈশিষ্ট্য চিহ্(ত করেছিল আর জন্ম দিয়েছিল ভারতীয় নবজাগরণের। তিনি ছিলেন অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যের এক সেতু। রাজা রামমোহন

রায় এবং মহাত্মা গান্ধী প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন দুটি সমাপ্তির, বলা যায় সূচনা এবং পরিনতির। আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম যুগে। প্রথম জন সুবিদিত আধুনিক ভারতের পিতা হিসেবে বা পথিকৃৎ হিসেবে এবং অন্য জন জাতির জনক হিসেবে।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম বাংলায় হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ সালের ২২ মে এক র(ণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে। তিনি ছিলেন আরবী, পারসী, সংস্কৃতি এবং বাংলা আর বিদেশী গ্রীক, ল্যাটিন হিব্রু ভাষায় সুপন্ডিত এক ব্যক্তি(। তাঁর সাহিত্যিক কর্মের মধ্যে Tufat-ul, Muwqh-hidin, ইংরেজী বেদান্তসূত্রের অনুবাদ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যিশু— সুখ শান্তির পথনির্দেশক ইত্যাদি। তাঁর জীবনের গু(ত্বপূর্ণ জলবিভাজিকা হলো ১৮১১ সালে তাঁর বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সতী হওয়া। এই ঘটনা রামমোহনের মনে গভীর অব্যক্ত(অনুশোচনা এবং ক(ণায় পূর্ণ হয়েছিল, যা তাঁকে সংকল্পবদ্ধ করেছিল এই অমানবিক প্রথা মুছে ফেলতে।

তাঁর সমাজ ভাবনা ঃ রামমোহন রায়ের আকাঙ(া ছিল সমস্ত রকম অযৌক্তি(ক আনুষ্ঠানিক ক্রি(য়াকর্ম থেকে এবং অশুভ রীতিনীতি থেকে হিন্দু সমাজকে মুক্ত(করা। ভারতীয় নারী মুক্তি(র তিনি ছিলেন প্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর্থক। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেছিলেন, ''Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindu Law of Inheritence''. ''আধুনিক অনধিকার প্রবেশ, নারীর প্রাচীন অধিকারের ওপর হিন্দু আইনের উত্তরাধিকার অনুসারে এই (দ্র পুস্তিকায়, তিনি বিরোধিতা করেছিলেন, নারীর বি(দ্ধে সমস্ত রকম বিভেদ ও অশুভ রাতিনীতির। তিনি বিরোধিতা করেন বহুবিবাহের, কুলীন প্রথার, এবং সতীদাহের এবং কন্যার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সমর্থনে এগিয়ে আসেন। রামমোহন প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের সমীপে যে ভারতীয় নারীদের অবস্থার উন্নতি সাধন করার এবং সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদকল্পে আইন প্রনয়ন করার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। যেমন তাঁর দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর ১৭তম রেগুলেশন পাস করেছিলেন, যা ঘোষণা করেছিল সতীদাহ বেআইনী ও শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ। এই আইন বা রেগুলেশন শু(করেছিল সমাজ সংস্কারের পদ্ধতি সামাজিক আইন প্রয়নের সাহায্যে। রামমোহন রায় ছিলেন শিশু বিবাহ এবং বর্ণ ব্যবস্থার র(ণশীলতার বি(দ্ধে এক নিরলস ও নির্দয় ধর্মযোদ্ধা যেখানে তিনি ব্যাখ্যাতি হয়েছিলেন একজন অগনতান্ত্রিক ও অমানবিক হিসেবে। তিনি বিধবাদের পুনঃর্বিবাহের স্বাধীনতা এবং মানুষ ও মানুষীর সম অধিকারের প(দাঁড়িয়েছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজ ঃ ধর্মের প্রগতিশীল ভাবনার প(রামমোহন দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত একে(শ্বর বাদ এবং পৌত্তলিকতা বিরোধী ইসলাম, সুফীবাদ, খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক শি(ার দ্বারা এবং পশ্চিমের উদার আর প্রগতিশীল তত্ত্বসমূহের দ্বারা। হিন্দু ধর্মগ্রন্থের একে(শ্বরবাদী তত্ত্ব প্রচারের মধ্যে দিয়ে তিনি গঠন করেছিলেন আত্মীয় সভা (১৮১৫-১৯)। ১৮২৮ সালে তিনি স্থাপন করেন ব্রাহ্মসভা, পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম সমাজ বি(শ্বাস করতো যা কিছু অস্তিত্বময় তার পিছনের কারণ ও উৎস ঈ(শ্বর। সুতরাং ঐ প্রকৃতি, পৃথিবী এবং স্বর্গ সমস্তই তাঁর সৃষ্টি।

নতুন বি(শ্বাসের প্রসার ছাড়াও, তিনি সরকারকে মনোনিবেশ করতে বলেন, আধুনিক পশ্চিমী শি(ার ওপর। তিনি নীরবে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিলেন। 'সম্বাদ কৌমুদী' নামের একটি বাংলা সাপ্তাহিক চালু করেন যেটা ছিল প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র যার সম্পাদক, প্রকাশক এবং ব্যবস্থাপক ছিলেন ভারতীয়রা। একবছর পরে তিনি প্রকাশ করতে শু(করলেন আর একটি পার্সী ভাষায় সাপ্তাহিক নাম 'মিরাত-উল-আখবর'।

১৮৩০ সালে রামমোহন ইংলন্ডে গমন করেন মুঘল সম্রাটের উপরাষ্ট্রদূত হিসেবে। ইংলন্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের রাজসভায় মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ্ তাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ইংলন্ডে নানা বিদ্বজন

সমাজে তিনি দা(ণভাবে গৃহীত হন, সেখানে রাজা তিন বছর অবস্থান করেন, আর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়, ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর।

বাংলায় ব্রাহ্মসমাজ, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর মৃত্যুমুখী অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। সমাজ পুন(জ্জীবিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নতুন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক দৃষ্টিকোণের দ্বারা ১৮৪৭ এবং ১৮৫০ এর মধ্যবর্তী বছরগুলিতে। এটি স্মরণে রাখা দরকার যে ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্বে দেবেন্দ্রনথ জোড়াসাঁকোয় গঠন করেছিলেন তত্ত্বভারঞ্জিনী সভা পরে যা পরিচিত হয় তত্ত্ববোধিনী সভা হিসেবে। যেমন এর কার্যত্র(ম ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত(ছিল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে, তত্ত্ববোধিনীসভা ত্র(মে হয়ে উঠেছিল এর প্রধান সাংগঠনিক শাখা। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যেখানে অ(য়কুমার দত্তের মতোন বড় লেখক ও পন্ডিত—শি(ক হিসেবে নিযুক্ত(হন। এর সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন পন্ডিত ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারাচাঁদ চত্র(বর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং অন্যান্য গুণীজন। জীবনের নানা(ত্রে বিচরনকারী নানা মতের প্রথিতযশা মানুষেরা। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রকাশ করেছিল এক টি মাসিক পত্র যার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, যা প্রসার ঘটিয়েছিল এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যত্র(মের। পরবর্তী সময়ে শীঘ্রই সমাজের ত(ন সদস্যরা চেষ্টা শু(করলো, শুধুমাত্র ব্রাহ্মবাদের মূলকেই প্রসারন নয় নতুন সমাজ চিন্তার সপ(বরং একই সঙ্গে প(পাতহীন কারণের প্রয়োগ, এমনকি ধর্মীয় বি(াসের মূলগত প্রবন্ধ বা লেখালিখির ওপর জোর দেওয়া। সত্তানারী শি(ার সপ(প্রচার, বিধবা পুনঃর্বিবাহের সপ(বলা, বহুগামীতা বা বহুবিবাহ এবং অসংযমের বি(দ্ধে প্রকাশ্য নিন্দা করেছিল। এছাড়াও চেষ্টা করেছিল সমাজের কাজ কর্মকে পরিচালনা করা, কঠিন সাংগঠনিক নিয়ম নীতির দ্বারা। কেশবচন্দ্র সেনের ভিতরে তারা সন্ধান পেয়েছিল সেই যোগ্য নেতার। ১৮৫৭ সালে তিনি যোগ দেন সমাজে এবং ১৮৬১ সালে তিনি সর্ব সময়ের এক প্রচারকে পরিণত হন। উন্নত চিন্তাধারা অগ্রসর হয়েছিল ত(ণ ব্রাহ্মদের দ্বারা, যার নেতৃত্বে ছিলেন কেশবচন্দ্র, যা গ্রহণযোগ্য ছিল না প্রাচীনপন্থীদের, যার নেতৃত্বে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, যিনি অস্বীকার করেছিলেন রামমোহন নির্দেশিত প্রাচীন হিন্দুপথ থেকে সরে আসতে। এর ফলস্বরূপ সমাজ ভেঙে গেল। পুরনো সংগঠন এখন থেকে পরিচিত হল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে। যার নেতৃত্বে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যদিকে কেশবচন্দ্র গঠন করলেন নতুন সংগঠন, যার নাম হলো 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। ঘোষিত হল 'ব্রাহ্মবাদ' ক্যাথলিক এবং সার্বিক। কেশব জোর দিয়েছিলেন পুতুল পুজা ও বর্ণব্যাবস্থা পরিহারের উপর।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্থাপন করেছিলেন 'ভারতীয় সংস্কার সভা'। এর পাঁচটি বিভাগ ছিল। নারীগণের উন্নতি, শ্রমিকদের শি(া, সস্তায় সাহিত্যের প্রকাশনা, সংযমের প(প্রচার, দানশীলতা সংগঠন শু(হয়েছিল নারীশি(ার এবং বই ও জার্নাল প্রকাশের জন্য। তাঁর অনুরোধ ১৮৭২ সালে ইংরেজ সরকার বা ভারত সরকার 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' বা 'পৌর বিবাহ আইন' পাস করেন। যাইহোক প্রধানত, তাঁরা মনস্থ করেছিল যুক্তি(সিদ্ধ বা বৈধতা দেবে ব্রাহ্ম মতে বিবাহকে, যা হিন্দু আইনের চোখে কোনভাবেই যুক্তি(সিদ্ধ ছিল না, এটা বাধা আরোপ করে তাদের ওপর যারা এর থেকে সুযোগ সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এটি একবিবাহ বাধ্যতামূলক করেছিল এবং নির্দেশ দিয়েছিল বর ও কনের বিবাহের সর্ব ন্যূন বয়স হবে যথাত্র(মে ১৮ এবং ১৪। এ.সি. ব্যানার্জ্জীকে অনুসরণ করে বলা যায়, এটি ছিল একটি গু(ত্বপূর্ণ পদ(প সমাজ সংস্কারের। ১৮৭২ সালে তাঁর বড় মেয়ের সঙ্গে কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজার বিবাহ দিয়ে কেশবচন্দ্র একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে সমাজে সংকট উপস্থিত করলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, অন্যান্য অনেকেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং স্থাপন করলেন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। সম্প্রদায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল তিনভাগে বিভক্ত(হয়ে যাওয়ার ফলে, উনিশ শতকের শেষের দিকে এটি পরিণত হয় একটি অবসন্ন ও পীড়িত প্রতিষ্ঠানে।

১২.২ ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন তার উৎপত্তির ে(ত্রে বিশেষভাবে ঋণী ছিল ১৯ শতকের অন্যতম অবিস্মরণীয় ব্যক্তি(ত্ব হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও'র কাছে। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ১৮২৬ সালে, ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের শি(ক হিসেবে হিন্দু কলেজে যোগদান করেছিলেন। তাঁর শি(ার মূল কেন্দ্র কিছু কর্তৃত্বকে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। তাঁর ইংরেজীতে লেখা বিখ্যাত কবিতা—যা ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দেমাতরম নামক দেশাত্মবোধক গানের পূর্বে লিখিত— তিনি দেখিয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনে পদানত ভারতের অবনতি প্রাচীন ভারতের গৌরবের তুলনায়। ডিরোজিও'র প্রভাব তাঁর ছাত্রদের ওপর ছিল অসাধারন। ১৮৩১ সালে তাঁর অকাল মৃত্যুর পর, তাঁর ছাত্ররা সভা সমিতি এবং জার্নাল প্রকাশের মধ্যে দিয়ে প্রগতিশীল চিন্তার বিস্তার অব্যাহত রেখেছিলেন। দলের অন্যতম নেতৃত্ব স্থানীয় সদস্যরা ছিলেন রসিককৃষ(মল্লিক, তারাচাঁদ চত্র(বর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

বস্তুত, সোত্র(াতেসের মতোই, ডিরোজিও'র অন্বেষণ ছিল সত্য এবং তা অভিযুক্ত(হয়েছিল যে তিনি ত(ণ প্রজন্মকে বিপথে চালিত করছেন। কিন্তু ডিরোজিও'র প্রভাব ছাত্র সমাজের ওপর অব্যাহত থাকে এবং এটি পরিচিত হয় ইয়ং বেঙ্গল অন্দোলন নামে। তৎকালীন সমস্ত নেতৃত্বস্থানীয় অন্দোলনগুলি এর সঙ্গে সংযুক্ত(ছিল।

১২.৩ বিদ্যাসাগর

ঈ(রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমকালে এবং পরবর্তী প্রজন্মে বিদ্যার সাগর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক ও শি(াবিষয়ক সংস্কারক। ১৮২০ সালে অত্যন্ত দরিদ্র এবং র(ণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। নিজেকে শি(ত করে তুলতে তিনি প্রচুর কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিসেবে তিনি নিজেকে চিহ্নি(ত করতে পেরেছিলেন এবং ১৮৫১ সালে তিনি কলেজের অধ্য(ে র মতো উচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর মানবতাবাদ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল দরিদ্র, অত্যাচারিত, ভাগ্যতাড়িত এবং সামাজিক কুপ্রথার শিকার, মানুষজনের প্রতি। তিনি আজও স্মরণীয় 'দয়ার সাগর' রূপে।

বিদ্যাসাগর সামাজিক এবং শি(াসংত্র(ান্ত সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আধুনিক ভারতবর্ষ গড়ে তোলার কাজে অবদান রেখে গেছেন। তাঁর দ্বারা যে সমাজ সংস্কারের কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছিল সেটির মূল বিষয় ছিল উৎপীড়িত স্ত্রীজাতির প্রতি সমবেদনা। বিধবা পুনঃর্বিবাহের জন্য তাঁর দীর্ঘ লড়াই শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ সালে আইন প্রণয়ন করেছিল হিন্দু বিধবার পুনঃর্বিবাহ আইন। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখার দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন, ধর্মগ্রন্থ সমূহে বিধবার পুনরায় বিবাহে অনুমতি আছে, কিন্তু হিন্দু সমাজের প্রায় সকলেই তাঁর বি(দ্ধে ছিলেন। বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন, কিন্তু হিন্দু সমাজ তাঁর এই সংস্কার প্রত্যাখান করে এবং এই আইন পাস হওয়ার ৫ বছরের মধ্যে মাত্র ২৫ জন বিধবার পুনরায় বিবাহ হয়। বিদ্যাসাগর সামাজিক নির্বাসন ভোগ করেছিলেন এমন কি তাঁর প্রাণ সংশয় ঘটেছিল। তিনি বহুবিবাহ প্রথার বি(দ্ধেও প্রচার চালিয়েছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন, এটি উচ্ছেদের জন্য আইন্ প্রণয়ন করতে। এছাড়াও ১৮৫১ সালে সহবাস সম্মতি পিছনে তাঁর ভূমিকা ছিল।

বিদ্যাসাগরের শি(াবিষয়ক সংস্কার অনেক বেশী বাস্তব সাফল্য লাভ করেছিল। তিনি অ-ব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী পড়াশুনা চালু করেছিলেন। তিনি কাজ

করেছিলেন দেশীয় ভাষায় শি(া প্রসারের জন্য এবং সহজ বাংলায় প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন যা ধরে রেখেছিল এক শতাব্দীর উপরেও এর মূল্য। স্ত্রী শি(ার ব্যাপারে তিনি প্রচুর মনোযোগ দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়গুলির সরকারী পরিদর্শক হিসাবে তিনি গঠন করেছিলেন, ৩৫টি মহিলা বা বালিকা বিদ্যালয় এর মধ্যে কয়েকটি তিনি নিজের খরচায় র(নাবে(ণ করেছিলেন। ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন গর্ভনর জেনারেলের পরিষদের আইন সদস্য কলকাতায় যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন তার সহযোগী। তিনি কলকাতায় একটি কলেজ বা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন যা এখন তাঁর নামে পরিচিত।

১২.৪ প্রার্থনা সমাজ

কেশবচন্দ্র সেনের মহারাষ্ট্র গমনের ফলস্বরূপ, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রার্থনা সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এর প্রধান স্থপতি ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, এছাড়া দুজন উল্লেখযোগ্য নেতৃদ্বয় হলেন, ডাঃ আত্মারাম পান্ডুরৎ এবং বি. জি. ভান্ডারকর। প্রার্থনা সমাজের দুটি প্রধান স্তম্ভ বা কাঁটা ছিল ধর্ম-কর্ম এবং সমাজ সংস্কার। রানাডে তী(ভাবে দেখিয়েছিলেন, বেশীরভাগ প্রচলিত অশুভ রীতিনীতি বিপরীত দিকে চলেছিল, যে অভ্যাস দেখা গিয়েছিল এবং উদ্বৃত হয়েছিল প্রাচীনযুগে, যেমন উদাহরণস্বরূপ, নারীদের নির্ভরশীল অবস্থা, শিশু বিবাহ, বিধবার পুনঃর্বিবাহে নিষেধাজ্ঞা, (দ্র উপ-বর্ণ বা নিম্নবর্ণ নগ্ন করেছিল অন্তঃবিবাহ বা সমজাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা। নারীজাতির অজ্ঞানতা ও তাদের পৃথক করে রাখা। বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা, নানা রকমের সংযম মেয়েদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। নানা বর্ণের একসঙ্গে বসে খাওয়া বা ভোজনে নিষেধাজ্ঞা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি। তিনি এছাড়াও শু(করেছিলেন শুদ্ধি আন্দোলন সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত(করেছিলেন চিৎকার চেঁচামেচি বিরোধী এবং সংযমী আর মাদকদ্রব্য পরিহার আন্দোলন। অন্য বি(াসী বা অন্য ধর্মের মানুষদের সমাজের ধর্মে প্রবেশের স্বীকৃতি এবং প্রচলিত হিন্দু বিবাহে যে প্রচুর অর্থের অপচয় হয়, তার হ্রাস, তিনি করেছিলন। তাঁর আন্দোলন খুব শীঘ্র ধারণ করেছিল সর্বভারতীয় চরিত্র।

রানাডের সমাজ সংস্কার আন্দোলন সমগ্র শতক ধরে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে বাহিত হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আরও দুজন সমর্থক সংস্কারক ছিলেন ধোন্দো কেশব কারভে এবং বিষু(শাস্ত্রী। রানাডে এবং কার্ভে বিধবা পুনঃর্বিবাহ আন্দোলন শু(করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সূচনা করেন বিধবাদের 'গৃহ সভা' বা 'Home Association' যা বিধবাদের শি(া যুগিয়েছিল। বিধবাদের 'হোম এ্যাসোসিয়েশ'নের ল(্য ছিল তাদের শি(কা হিসেবে ধাত্রী হিসেবে এবং সেবিকা হিসেবে প্রশি(ণ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা। ভারতবর্ষের কোনও অংশই এতোখানি সাফল্যের সঙ্গে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের কাজ চালাতে পারেনি। প্রার্থনা সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় যেমন মহারাষ্ট্রে যা সৃষ্টি করেছিল অত্যন্ত গভীর প্রভাব।

১২.৫ দয়ানন্দ সরস্বতী এবং আর্য সমাজ

মূলা শঙ্কর পরবর্তীকালে দয়ানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত, ১৮২৪ সালে গুজরাটের কাথিয়াওয়াড়-এর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ২১ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন, এই অভিপ্রায়ে যে, বিবাহের মতো একটি ব্যাপারে যাতে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে না হয় এবং তাঁর আত্মার উত্তেজনা ও আন্দোলন যাতে শান্ত হয়।

গভীরভাবে বেদসমূহ এবং ভারতীয় দর্শন অধ্যয়নের পর, দয়ানন্দ সরস্বতী এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ''আর্যরা

ছিলেন মনোনীত মানুষ, বেদসমূহ ছিল মনোনীত বাণী, এবং ভারতবর্ষ মনোনীত ভূমি।'' এই বি(্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বেতে স্থাপন করেছিলেন আর্য সমাজ। আমাদের অবহিত হওয়া দরকার যে, 'বেদে ফিরে চলো' নামক (-াগান বা বাণী ছাড়াও, আর্য সমাজ একই সঙ্গে পরিকল্পনা করেছিল সমাজ সংস্কারের। যাইহোক এটি দাঁড়িয়েছিল চতুবর্ন ব্যবস্থার জন্যে যা নির্ধারিত হয়েছিল যোগ্যতার ভিত্তিতে জন্মের দ্বারা নয়। আর্য সমাজ দাঁড়িয়েছিল নারী ও পু(ষের সমাজ এবং শি(াসংত্র(ান্ত (ত্রে সমঅধিকারের ওপর। আর্য সমাজ বিরোধীতা করেছিল অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ ব্যাবস্থা, শিশু বিবাহ, এবং সমর্থন করেছিল আন্তঃর্বিবাহ এবং বিধবার পুনরায় বিবাহকে, দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজকে প্রস্তুত করেছিলেন বা যুগিয়েছিলেন সমাজ পরিচালনার এবং নৈতিক মূল্যবোধ।

১২.৬ শ্রীরামকৃষ(এবং স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ(পরমহংস, যিনি বাস ও আরাধনা করেছিলেন দ(িণে(্বরের মন্দিরে, তিনি ছিলেন এক মরমীয়া। তিনি দেখেছিলেন সমস্ত রকমের ধর্মই এক সর্বশক্তি(মানের আরাধনা, সবরকম ধর্মীয় খোঁজ আসলে ''একই ঈ(্বরের সন্ধান যাঁর কাছে সকলের গন্তব্য, যদিও নানা পথে সে সন্ধান।'' তিনি শি(া দেন, 'দয়া নয়, কিন্তু মানুষের জন্য সেবা অবশ্যই সম্মানিত হবে ঈ(্বরের মতো।'

রামকৃষে(র মানবতাবাদ খুব গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তাঁর শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্তকে, যিনি স্বামী বিবেকানন্দ হিসেবে অধিক পরিচিত। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষে(র মৃত্যুর পর, তখন বিবেকানন্দের বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর সমগ্র, জীবন উৎসর্গ করবেন। তাঁর গু(র বাণী প্রসারের উদ্দেশ্যে এবং পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি আমেরিকা পাড়ি দিলেন এবং শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় যোগদান করলেন। 'দি নিউইয়র্ক হেরাল্ড'-এর প্রতিবেদনে আমরা দেখলাম—''তাঁর বক্ত(ব্য শোনার পর আমরা অনুভব করলাম কতখানি নির্বুদ্ধিতা হবে এইরকম শি(ত জাতির কাছে ধর্মপ্রচারক পাঠানো।''

বিবেকানন্দের কোন বি(্বাস ছিল না সমাজ সংস্কার কার্যে যা সরবরাহ হয়েছিল আমুদে শি(ার উপকরণ হিসেবে অভিজাত শ্রেণীর কাছে। তিনি যুক্তি(দিয়েছিলেন ঐ শি(া, সমস্ত কিছুর সঙ্গে ফলস্বরূপ এসেছিল, যা স্বয়ংত্রি(য় ভাবে মুক্ত(করবে সমাজকে তার অসুস্থতা থেকে। সেই প্রসঙ্গে বা তার দ্বারা অত্যাবশ্যকতার সঙ্গে আচার-নিধি আন্দোলনের সমাধা হবে। তাঁর পুস্তিকায় বলা হয়েছিল, 'আমি একজন সমাজতন্ত্রী'। বিবেকান্দ আবেদন করেছিলেন ভারতবর্ষের উচ্চ শ্রেণীর কাছে, তাঁরা তাদের সামাজিক অবস্থান ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা সরিয়ে রেখে মিলতে চেষ্টা ক(ন, সাধারন নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে। তাঁর মতে কৃষকের লাঙ্গলে, মাংস বিত্রে(তার চুল্লী থেকে, কুটীর থেকে, অরণ্য থেকে, কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে থেকে নতুন ভারত উঠে এসেছিল। তিনি আরও বি(্বাস করতেন, দরিদ্র এবং পদদলিতদের উন্নতিকল্পে কাজ করায়।

এক শতাব্দী পূর্বেই তিনি অনুমান করেছিলেন রীতিবিযুক্ত(শি(ার আধুনিক ধারণা এবং স্বা(রতার অভিযানের। যা কিছু সম্পদ সমাজ ব্যয় করতে সমর্থ, তা যেন অবশ্যই প্রাথমিক শি(ার (ত্রে ব্যয় করা হয়, মহাবিদ্যালয় ও বি(্ববিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য নয়। তিনি বলেছেন, ''তোমরা সমস্ত সংস্কার আন্দোলনগুলি যেমন সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, এবং বিধবার পুনঃর্বিবাহ সাফল্যযুক্ত(হবে না, যতদিন তারা সীমাবদ্ধ থাকবে উচ্চকোটির শতকরা ১ ভাগ জনসংখ্যার মধ্যে।'' নারী মুক্তি(র জন্য আবেদনে বিবেকানন্দ কখনই ক্লান্ত হন নি। তাঁর সংস্কারের আদর্শ দাঁড়িয়েছিল নারীজাতির অবস্থার উন্নতি, শি(া ব্যাবস্থার খোল নলচে বদলানো এবং বর্ণভেদ ব্যবস্থার বিলুপ্তির উপর। তাঁর স্বপ্নকে

সত্য করতে, তিনি স্থাপন করেছিলেন, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ(মঠ ও মিশন। বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতীয় যুব সমাজের পথপ্রদর্শক, তিনি যুব সমাজের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'ওঠো, জাগো এবং শি(ত শ্রেণীর উদ্দেশ্যে এই কটি কথা বলে আহ্বান করেছিলেন—দীর্ঘকাল যাবৎ কোটি কোটি মানুষ বাস করছে (ধা ও অজ্ঞানতার মাঝে, আমি অভিমত পোষণ করছি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে এক দেশদ্রোহী, যারা শি(ত হয়েছে তাদের অর্থে বা ব্যয়ে, সামান্য তম ঋণ পরিশোধ করেনি তাদের কাছে।''

১২.৭ থিওসফিক্যাল আন্দোলন

থিওসফিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে মাদাম ব্লাভাটস্কি এবং কর্ণেল অলকট দ্বারা। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতারা ভারতে পদার্পণ করেন এবং স্থাপন করেন সোসাইটির প্রধান কার্যালয় মাদ্রাজের কাছে (Adyar) আডইয়ার নামক স্থানে। ১৮৮৮ সালে ইংলন্ডে মিসেস অ্যানি বেসান্ত এই সোসাইটিতে যোগ দেন। তাঁর সদস্যপদ গ্রহণ প্রমাণ করেছিল, বিরাট মূল্যের সম্পদ সমাজের কাছে।

শি(ার (ত্রে থিওসফিক্যাল সোসাইটি। প্রশংসনীয় কাজ করেছিল। এই ব্যাপারে কার্য হ'ল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বারানসীতে কেন্দ্রিয় হিন্দু মহাবিদ্যালয় চালু করা। সোসাইটি পিছিয়ে থাকা শ্রেণী(নারী এবং বালকদের জন্য বিদ্যালয় চালু করেছিল এবং এছাড়াও উৎসাহিত করেছিল ব্রতী বালক আন্দোলনে যোগদান করায়। সোসাইটি বিরোধীতা করেছিল শিশু বিবাহের, বলেছিল বন্ধ্যাবস্থার অবলুপ্তির কথা, জাতিচ্যুত মানুষের উন্নতিসধান, এবং বিধবাদের অবস্থার উন্নতিসাধন, করার কথা। থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রমাণ করেছিল একটি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা—ভারতীয়দের জাগরণ ও আত্মসম্মানের বিষয়টি প্রখ্যাত ইওরোপীয় থিওসফিস্ট যেমন অ্যানীবেসান্ত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, ভারতের সংস্কৃতিক মহত্বের কথা, এবং ভারতের জাতিয়তাবাদ বিকশিত হওয়ার সাহায্য করেছিলেন।

উপসংহারে এসে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে ধর্মীয় সংস্কার ও সমাজ সংস্কার বস্তুত একটিই প্রগতিশীল মেজাজের দুটি দিক বা আকৃতি, যার ল(্য ছিল ভারতবর্ষের পুনরভ্যুত্থান। প্রথমে প্রায় সমস্ত ধর্মীয় সংস্কারকগনেরই সমাজ সংস্কার আন্দোলনে অবদান ছিল। ধীরে ধীরে ঐ আন্দোলন চরিত্রের দিক থেকে হয়ে উঠেছিল ধর্মনিরপে(, এবং গান্ধীজী স্বাধীনতার জন্য একে গড়ে তুলেছিলেন সংগ্রামের অবিভাজ্য অংশরূপে।

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. এ. সি. ব্যানার্জী—দি নিউ হিস্টরি অব মর্ডান ইন্ডিয়া

২. এন. এস. বোস—দি ইন্ডিয়ান অ্যাওকেনিং অ্যান্ড বেঙ্গল

৩. বিপান চন্দ্র—মর্ডান ইন্ডিয়া

৪. অমিতাভ মুখার্জী (সম্পাদিত)—সোশ্যাল রিফর্ম মুভমেন্টস্ ইন বেঙ্গল

৫. কে. কে দত্ত—ডন অব রিনাসেন্ট ইন্ডিয়া

৬. দিলীপ বি(াস—রামমোহন স্মরণ/রামমোহন সমী(া

১২.৯ অনুশীলনী

১. রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র পর্যন্ত ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলনগুলি আলোচনা কর।

২. ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন এবং আর্য সমাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৩. বিদ্যাসাগরের অবদানগুলির কথা আলোচনা কর।

৪. থিওসফিক্যাল আন্দোলন এবং প্রার্থনা সমাজ সম্পর্কে লেখ।

৫. স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে ভারতীয় যুবসমাজকে প্রভাবিত করেছিলেন?

একক ১৩ ❑ জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রে(াপট

গঠন

১৩.০ প্রস্তাবনা
১৩.১ জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রে(াপট
১৩.২ গ্রন্থপঞ্জি
১৩.৩ অনুশীলনী

১৩.০ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্য(করেছিল ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের পূর্ণ বিকাশ। পার্সিভ্যাল স্পীয়ার এই পর্যায়টিকে সাম্রাজ্যবাদের চরম উন্নতির পর্যায় (The Imperial Heyday) রূপে বর্ণনা করেছেন। সমগ্র বিশ্বের এক চতুর্থাংশ জুড়ে যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল ইংল্যান্ড ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু। ভারত ছিল এর সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ, যার দ্বারা ইংল্যান্ড সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের এই সম্পূর্ণ তাই ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চেতনার জাগরণ ঘটায় যে অভিব্যক্তি(র প্রকাশ ঘটে ১৮৮৫ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। বস্তুতঃ, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রতিক্রি(য়া স্বরূপই আধুনিক ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব হয়। ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও তার ফলাফলই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রয়োজনীয় ইন্ধন যুগিয়েছিল। এ(ত্রে বিপানচন্দ্রের 'Modern India' নামক পুস্তকের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য যেখানে তিনি বলেছেন যে দুই প(র স্বার্থের সংঘাতই ছিল এই সংঘর্ষের মূল কারণ। ব্রিটিশদের ভারত শাসনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করা যার দ্বারা অনেক সময়ই ভারতের মঙ্গল বিসর্জিত হয়েছিল।

১৩.১ জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রে(াপট

পাশ্চাত্য শি(া প্রসারের ফলে, শি(ত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একধরনের আধুনিক যুক্তি(গ্রাহী জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিকতার অবমাননাকে অনুভব করে। তারা (শো (Rousseau), টমাস পেইন (Thomas Pain), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর লেখার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ব্যগ্রতার সঙ্গে সমসাময়িক ইওরোপীয় দেশগুলিতে সংঘটিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির সমক(হতে সচেষ্ট হয়। তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিকতার কুফল সম্পর্কিত অবহিতি বিকাশ লাভ করতে থাকে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ শক্তি(শালী আধুনিক ভারতের স্বপ্ন দেখতে থাকে। উল্লেখ্য এ(ত্রে রাজভাষা, ইংরেজী, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপন করে যার ফলে তারা একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি, আকাঙ(া এবং ধারণার অংশীদার হয়। এইভাবেই ইংরেজী শি(া ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার বিকাশে এক গু(ত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়।

গুণগতভাবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ছিল ভিন্ন। এক অত্যুগ্র প্রশাসনের আওতায় ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতি এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয় যার কাঠামো স্থির হয় ব্রিটেনের দ্রুত বিকাশমান শিল্পায়িত অর্থনীতির সঙ্গে সাহায্য রেখে। ভারতের বাজারকে উন্মুক্ত(করা

হয় ব্রিটেনে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রীর জন্য এবং ভারত পরিণত হয় ব্রিটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী আনুষঙ্গিকে। বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বিপুল আমদানী ও তার অন্তঃপ্রবাহ ভারতীয় হস্তশিল্পের পরিসরে দুর্ভাগ্যের সংকেত বয়ে আনে। উচ্চ (মতাসম্পন্ন যন্ত্রোৎপাদিত বিপুল পরিমাণের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে ভারতীয় হস্তশিল্পোৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। এ(ত্রে ভারতের তাঁত বয়ন শিল্প, উলজাতি বস্ত্র শিল্প, রেশম বস্ত্র শিল্প সর্বাধিক (তিগ্রস্থ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী প্রত্য(করে ঐতিহাসিক ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির পতন এবং বাণিজ্যিক পথে একসঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবাহের আগমন যার ফলস্বরূপ ভারতের গ্রামীণ জীবন যাত্রার অবনমন ঘটে। কৃষক ও কারিগরের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, সামগ্রিকভাবে ভারতের বুকে দারিদ্রের করাল ছায়া নেমে আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র ব্যাখ্যার (ত্রে উদ্যোগ নেয় এবং বি(-ষণের মাধ্যমে তারা শোষণমূলক চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত হয়। ফলে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কিত যে হিতবাদী ধারণা তারা পূর্বে পোষণ করত তার অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল উদ্দেশ্য যে ভারতীয় অর্থনীতিকে অবদমন করে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, তাও পরিস্ফূট হয়। দাদাভাই নওরোজী (Proverty and Un-British Rule in India). রমেশচন্দ্র দত্ত (Economic History of India) এবং রানাডে (Indian Economy) ঔপনিবেশিকতার শোষণমূলক চরিত্রটিকে প্রকাশ করে ভারতে শক্তি(শালী অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করেন। এই বিষয়টির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন বিপানচন্দ্র তাঁর ''Rise and Growth of Economic Nationalism in India'' নামক গ্রন্থে। দাদাভাই নওরোজী ভারতের দারিদ্র সম্পর্কিত গবেষণায় দেখান কিভাবে ভারত প্রতিদিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছিল। সুতরাং একদিকে ছিল উন্নয়নের আরোহন আর একদিকে ছিল উন্নয়নের অবনমন।

সাদা চামড়ার মানুষদের স্বাজাত্য গরিমা ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ত্বরান্বিত করার (ত্রে এক গু(ত্বপূর্ণ অনুঘটক। শাসকশ্রেণীর জাতিগত গরিমা ভারতীয়দেরকে শ্রেণী, বর্ণ, পেশা এবং ধর্মের নিরিখে নিকৃষ্টতররূপে চিহ্নি(ত করে। ভারতীয়রা প্রায়ই ইংরেজদের দ্বারা অপমানিত ও আত্র(ান্ত হত। ব্রিটিশরা এদেশে যে আইনী শাসনব্যবস্থা জারি করেছিলেন তাও ছিল দাম্ভিকতাপূর্ণ, যেখানে সাম্যের আদর্শ ছিল উপে(ত। আইনের দোহাই দিয়ে যেকোন প্রকার শাস্তি থেকে ইংরেজরা রেহাই পেয়ে যেত। যেকোন প্রকার ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার হাত থেকেও ইংরেজরা নিষ্কৃতি পেত। ব্রিটিশরা এদেশে শাসক ও শাসিতের জন্য দুধরনের বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। বস্তুত ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে এই জাতিগত বৈষম্য যেমন চাকুরীর সুযোগসুবিধা, রেলে ভ্রমণের (ত্রে প্রতিফলিত হয়, তেমনই প্রতিফলিত হয় ইওরোপীয় ক্লাবগুলিতে এমনকি ক্রি(কেট খেলার মধ্যেও। এই জাতিগত বৈষম্যই ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একটি উদীয়মান জাতির প্রতি ঔপনিবেশিক অবমাননা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, যা তাদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পশ্চিমের সঙ্গে প্রাথমিক সংযোগের ফলে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইওরোপীয় দার্শনিকদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং তারা আধুনিক, গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করে। উল্লেখ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা ইওরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির দ্বারা এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিল যে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার নিপীড়নমূলক চরিত্র তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। ভারতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্যে যে, ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন এ সত্য তখন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী উপলব্ধি করতে পারেনি। এমনকি রামমোহনের মত ব্যক্তি(ও ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা বিপথগামী হয়েছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের আশায় যারা ব্রিটিশ শাসনকে প্রাথমিকভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন তারা ত্র(মশ হতাশায় নিমজ্জিত হন। পরিবর্তে উপলব্ধি করেন ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের ত্র(মবর্ধমান দারিদ্রের চেহারাকে। সর্বোপরি ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা আরও হতাশ হন যখন তারা ত্র(মবর্ধমান বেকারত্বের সমস্যায় জর্জরিত

হতে থাকে। পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে যখন ১৮৭৮ খ্রীঃ একটি নতুন আইন পাশের মাধ্যমে ভারতীয়দের জন্য সিভিল সার্ভিস পরী(ার্থীর বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯এ ধার্য করা হয়। সুতরাং সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের প্রবেশ পথ অপ্রশস্ত হয়ে যায়। ভারতীয়রা উপলব্ধি করে যে বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি(ই একমাত্র তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বর্ধিত করতে পারে। সং(েপে ভারতের তিনটি প্রধান শ্রেণী—মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণী—ত্র(মশ উপলব্ধি করে যে পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনের একমাত্র পন্থা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি(।

ব্রিটিশ অত্যাচারমূলক শাসনের দ(ণ পরো(ভাবে এদেশে যে উন্নতিগুলি পরিল(ত হয় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতে রেলপথের প্রচলন, ডাকব্যবস্থার উন্নতি, টেলিগ্রাফের আনয়ন এই বৃহৎ দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নৈকট্য স্থাপন করে। ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত হয়। ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার এদেশে যে আধুনিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল তার ফলে সারা ভারতে এক ঐক্যত্ব স্থাপিত হয়। স্থানীয় স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতির ধ্বংসের ওপর যে আধুনিক বাণিজ্যিক অর্থনীতি প্রতিস্থাপিত হয় তার ফলে ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে একধরনের সামগ্রিকতা পরিল(ত হয়। সমগ্র ভারতবাসী একটি একক অর্থনীতির আওতাভুক্ত(হয়। একটি জাতীয় বাজার নির্মাণ করা হয় এবং বিভিন্ন বাজারের দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের মধ্যে অভিন্নতা পরিল(ত হয়। দেশ ব্যাপী ঐকত্বের চেতনা জাগ্রত হয়। সকল ভারতবাসী উপলব্ধি করে যে তারা সকলেই এক এবং অদ্বিতীয় শত্রুর দ্বারা নিপীড়িত।

ভারতীয় ও ইওরোপীয় পন্ডিতরা ভারতীয় শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এবং মহান শাসক অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিত্র(মাদিত্য ও আকবরের রাজনৈতিক কৃতিত্বের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্যের সন্ধান পায়। এই ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণাতেই ভারতীয়রা সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের বি(দ্ধে প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়। উইলিয়াম জোন্স, ম্যাক্সমুলার, রানাডে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভান্ডারকারের মত ব্যক্তি(ত্ব ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। অন্যদিকে রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ(ও বিবেকানন্দ সমাজ সংস্কারে অগ্রবর্তী হন। ফলে এই সকল কিছুর আবহে ভারতীয়রা আত্মবি(াসে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের বি(দ্ধে অবতীর্ণ হয়।

১৮৭৬-১৮৮০ সালে লর্ড লিটনের প্রতিত্রি(য়াশীল শাসনব্যবস্থা ভারতীয়দের রাজনৈতিক সচেতনতার আরও প্রকটিত হয়। **প্রথমতঃ,** ইংল্যান্ডের বহু উৎপাদনকারীদের সন্তুষ্টি বিধানে লর্ড লিটন ভারতে আমদানীকৃত ব্রিটিশ বস্ত্রের ওপর সকল প্রকার শুল্ক তুলে দেয়। **দ্বিতীয়তঃ,** ভারতীয় কোষাগারকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উচ্চ ব্যয় নির্বাহের উপাঙ্গে পরিণত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ আফগানিস্তানের বি(দ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কথা বলা যায়, সে (ত্রে উচ্চ ব্যয় ভারতীয়দেরকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলনমুখী করে তুলেছিল। **তৃতীয়তঃ,** Vernacular Press Act বা দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন (১৮৭৪) পাশের মাধ্যেমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। **চতুর্থতঃ,** ১৮৭৮ এর অস্ত্র আইন (The Arm Act of 1878) এর মাধ্যমে ভারতীয়দের নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্য এদেশীয় মানুষদের অসন্তোষ ইন্ধন যোগায়। **পঞ্চমতঃ,** ১৮৭৮ খ্রীঃ একটি নতুন আইন পাশের মাধমে ভারতীয়দের জন্য সিভিল সার্ভিস পরী(ার সর্বোচ্চ বয়স সীমা ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ এ আনা হয়। সুতরাং সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রবেশ পথ অপ্রশস্ত হয়ে যায়। **ষষ্ঠতঃ,** ১৮৭৭ সালে যখন ভয়াবহ দুর্ভি(র করাল ছায়া নেমে আসে তখন দিল্লীতে সাম্রাজ্যবাদী দরবারের অনুষ্ঠান ভারতীয়দের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বালায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ''A Nation in Making'' এ লেখেন—বড়লাট লিটনের প্রতিত্রি(য়াশীল শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের ঔদাসীন্যে আঘাত হানে এবং জগজীবনকে উদ্দীপিত করে। যে উদ্দীপনা ব্যতীত সকল আন্দোলন সম্ভবত ব্যর্থ হত (''The reactionary administration of Lord Lytton had aroused the public from its attitude of indifference and had given stimulus to public life... They help to stir a community into life, a result that

years of agitation would perhaps have failed to achieve."

বা(দের স্তূপে আগুন সংযোগ করে ১৮৮৩ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড রিপনের আমলে ইলবার্ট বিল বিতর্ক। ইলবার্ট বিল সারা দেশ ব্যাপী আন্দোলনকে প্রসারিত করে এবং ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী আকাঙ(াকে শক্তি(শালী করে তোলে।

১৩.২ গ্রন্থপঞ্জি

১. E. Embree—Charles Grant & the British Rule in India.

২. Eric Stokes—The English Utilitarians & India.

৩. Bipan Chandra—India's Struggle for Independence.

৪. Summit Sarkar—Modern India.

৫. Dipak Kumar Aich—Emergence of Modern India Elite

১৩.৩ অনুশীলনী

১. ভারতের জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রে(াপট আলোচনা কর।

একক ১৪ ❑ সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশে সংবাদপত্র, শিল্প এবং সাহিত্যের ভূমিকা

গঠন

১৪.০ সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশে সংবাদপত্র, শিল্প এবং সাহিত্যের ভূমিকা
১৪.১ প্রকাশনা ও জনমত
১৪.২ গ্রন্থপঞ্জি
১৪.৩ অনুশীলনী

১৪.০ সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশে সংবাদপত্র, শিল্প এবং সাহিত্যের ভূমিকা

ভারতীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিকতার অবমাননাকে অনুভব করে। পাশ্চাত্য শি(া প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তারা আধুনিক যুক্তি(গ্রাহ্য, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। তারা (শো, পোইন এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখার দ্বারা পরিচিত হয় এবং ইওরোপীয় দেশগুলিতে সংঘটিত সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির সমক(হতে সচেষ্ট হয়। তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিকতার কুফল সম্পর্কিত অবহিতি বিকাশলাভ করতে থাকে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ শক্তি(শালী আধুনিক ভারতের স্বপ্ন দেখতে থাকে। সাহিত্য ছিল জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে দেশপ্রেমের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ স্মরণীয় (১৮৩৮-১৮৯৪)। তাঁকে বাংলার নবজাগরণের দ্বিতীয় পর্বের এক মহান ব্যক্তি(ত্বের মর্যাদা দেওয়া হয় (''The greatest figure of the second phase of the Bengal Renaissance) বাংলা ভাষায় জাতীয়তাবাদী সাহিত্য রচনার (ে ত্রে তার অবদন অনস্বীকার্য। একাধারে বিভিন্ন প্রকার গুণের একত্র উপস্থিতি ছিল তাঁর ব্যক্তি(ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুণাবলীর মিলনের চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, প্রখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক কোঁৎ (Comte) এর প্রত্য(বাদ এবং গীতার আধ্যাত্মবাদের মিলনে প্রবৃত্ত হন। ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি ছিলেন মহান। তাঁর উপন্যাসগুলি ছিল সামাজিক সচেতনতা, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা সমৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর লেখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দেশপ্রেম। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী চিন্তার দ্বারা সমৃদ্ধ। একজন প্রখ্যাত লেখক তাঁকে বিশেষিত করেছেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃত পিতা (Real father of Indian Nationalism) হিসেবে। ১৮৮২ খ্রীঃ রচিত আনন্দমঠ উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর রচিত বিখ্যাত সঙ্গীত বন্দেমাতরম আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তীকালে জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। এই সঙ্গীতটি ভারতীয়দের, মাতৃভূমি মুক্তি(র বাসনায় জীবন বিসর্জন দিতে অনুপ্রাণিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে হিন্দুত্বের পুন(জ্জীবনকারী রূপে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী 'Europe Reconsidered' নামক বর্তমান গবেষণায় এই উক্তি(তার যৌক্তি(কতা খুঁজে পায় না। 'বঙ্গদর্শন' ছিল বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার। ১৮৭২ থেকে ১৮৭৬ সাল অবধি তিনি এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকা সুবিদিত লেখকদের মিলনস্থলে পরিণত হয়। এটি ছিল ভারতের একটি নেতৃস্থানীয় সাময়িক পত্রিকা। বাংলা তার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিল। পুরাতন ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে একটি নতুন বাংলা গড়ে তোলার তাগিদেই তিনি প্রবন্ধ ও উপন্যাস

রচনা করেন। একজন ব্যক্তি(যিনি একাধারে ছিলেন শিল্পী এবং সংস্কারক, তাঁর (ে ত্রে নতুন বাংলার গঠন ছিল অবশ্যই পৃথক উদ্দেশ্য। স্যার অরবিন্দ মন্তব্য করেছেন—পূর্বে বঙ্কিম ছিলেন একজন শিল্পী এবং পরর্তীকালে তিনি হন একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ও জাতি সংগঠক (''The earlier Bankim was an artist and the later Bankim was a seer and a nation builder.'')

জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমমূলক সাহিত্যগুলি স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা ভীষণভাবে উজ্জীবিত হয়। এই সময় দেশপ্রেমমূলক গানগুলির রচয়িতারা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, মুকন্দ দাস এবং অন্যান্যরা। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে 'রাখীবন্ধন' উৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন। যা পথ পরিত্র(মারত অবস্থায় দেশের জনসাধারণ গাইতে থাকে। ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার নেতৃস্থানীয় সাহিত্যিক, যিনি অজস্র কবিতা এবং ছোট গল্পের মাধ্যমে বাংলার গ্রাম্য সমাজের সৌন্দর্য বর্ণনা করে দেশবাসীর মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করার অবদান রাখেন। তাঁর শৈল্পিক গুণের বহুমুখী পথই তাঁকে সামাজিক প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে অবহিত করে। তিনি প্রত্য(ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অরবিন্দ ঘোষ, সতীশচন্দ্র মুখার্জীর মত সত্রি(য় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে। তিনি 'National Council of Education' এর সঙ্গেও যুক্ত(ছিলেন।

জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার (ে ত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত ঈ(রচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১-১৮৫৮), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় (১৮৩৮-১৯০৩), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৭৪-১৯০৯) অ(য়কুমার বড়াল এবং অন্যান্যদের অবদান অনস্বীকার্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) তাঁর বিখ্যাত গান লেখেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার'। তিনি একজন সরকারী কর্মচারী হওয়ায় জাতীয় আন্দোলনে প্রত্য(ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু বিভিন্ন দেশপ্রেমমূলক গান ও নাটক রচনা করে পরো(ভাবে তিনি জাতীয় আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ভুদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু এবং রমেশচন্দ্র দত্তর লেখাও জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার (ে ত্রে উল্লেখের অবকাশ রাখে। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর উপন্যাসে মুঘলদের বি(দ্ধে মারাঠা ও রাজপুত আন্দোলনের যে চিত্র তুলে ধরেন তা জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রাণিত করে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটক রচনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাব প্রবণতাকে শক্তি(শালী করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' ব্রিটিশ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের জীবন্ত চিত্র তুলে ধরে যা প্রত্যেককে নাড়া দেয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙালীর আত্মবি(্বাসকে জাগ্রত করার জন্যে লেখেন 'সিরাজ-উদ-দৌল্লা', 'মিরকাশিম', এবং 'ছত্রপতি শিবাজী'-র মত নাটক।

বাংলা ভাষার মত অন্যান্য দেশীয় ভাষা যেমন হিন্দী, উড়িয়া, অসমীয়া, তামিল প্রভৃতি পশ্চিমের সঙ্গে সংযোগ র(ার (ে ত্রে তৎপর হয়ে ওঠে। ল(্য করার বিষয় হিন্দী এবং আসামী ভাষার বিকাশের (ে ত্রে মিশনারীরা উদ্যোগী হয়েছিলেন। আধুনিক হিন্দী ভাষার জনকরূপে পরিচিতি ছিলেন ভরতেন্দু হরিশচন্দ্র। লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া দ্বারা অসমিয়া ভাষা নবরূপ পায়। একইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িয়া, মারাঠী, তামিল এবং গুজরাটি ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল। বেশীরভাগ দেশীয় ভাষাই পশ্চিমী সংযোগ র(ার (ে ত্রে খ্রীষ্টান মিশনারী এবং প্রাচ্যবিদ্‌দের দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম কেরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িয়া লেখকদের মধ্যে ফকির মোহন সেনাপতি, রাধানাথ রায় এবং মধুসূদন রায় এর নাম উল্লেখের দাবী রাখে। মারাঠী ভাষায় বিখ্যাত ছিলেন বিষু(শাস্ত্রী চিপলঙ্কার, তামিলে বিখ্যাত ছিলেন সুব্রাহ্মণ্য ভারতী, উর্দুতে বিখ্যাত ছিলেন আলতাফ হুসেন হালি।

ভারতীয় এবং ইওরোপীয় পন্ডিতরা ভারতীয় শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, দর্শন এবং ভারতের ইতিহাসের মহান শাসক অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিত্র(মাদিত্য ও আকবরের রাজনৈতিক কৃতিত্বের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্যের সন্ধান পায়। এই ঐতিহ্যের অনুপ্রেণাতেই ভারতীয়রা সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের বি(দ্ধে প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়। উইলিয়াম জোন্স, ম্যাক্স মুলার, রানাডে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভান্ডারকারের মত ব্যক্তি(ত্ব ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। অন্যদিকে রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ(ও বিবেকানন্দ সমাজ সংস্কারে অবতীর্ণ হন। ফলে এই সকল কিছুর আবহে ভারতীয়রা আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হন এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের বি(দ্ধে অবতীর্ণ হন।

১৪.১ প্রকাশনা ও জনমত

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেশীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্যগুলি কিছু ব্যতিত্র(ম ছাড়া, উচ্চমানের ছিল না। মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যাও ছিল কম। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শি(ার আলোকে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা উদ্ভাসিত হওয়ার পর দেশীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্যের (ে ত্রে নতুন উদ্যম সংস্কার কার্য চালু করেন। তাঁর উপলব্ধি করেন যে আধুনিক ধারণাকে জনসাধারনের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার একমাত্র উপায় দেশীয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করা। এইভাবেই যে ধারনাগুলিকে ইংরেজরা মুষ্টিমেয় শহুরে মানুষদের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন তার প্রসার সাধন সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সচেতনতার বিকাশ ঘটেছিল বিকাশমান ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমেই। সংবাদপত্র ছিল দেশব্যাপী জনমত গঠনের প্রধান মাধ্যম। সংবাদপত্রের দ্বারাই ভারতীয়রা একটি সাধারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা আবহে নিজেদের সত্তাকে উপলব্ধি করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও আম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ হতে দেখিনা। কিন্তু সাংবাদিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই তার সাফল্যমণ্ডিত যাত্রা শু(করে। সংবাদপত্রের প্রকাশন মাধ্যম আরও দ্রুত উন্নত হয় মুদ্রণ প্রযুক্তি(র বিকাশের মাধ্যমে, এদেশে যার আবির্ভাব হয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা। তারা সর্বপ্রথম মুদ্রণ প্রযুক্তি(র ব্যবহার করেন ধর্মীয় সাহিত্য রচনার (ে ত্রে। ১৭৮০ খ্রীঃ হিক্কির প্রকাশিত Bengal Gazette ছিল ভারতে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র। প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল 'সমাচার দর্পণ'। প্রকাশক ছিলেন মার্শম্যান (Marshman) যিনি শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে যুক্ত(ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে সকল সংবাদপত্র দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার (ে ত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখ্য সোমপ্রকাশ (১৮৫৮), শি(াদর্পন (১৮৬৪), বঙ্গদর্শন (১৮৭৩), আর্যদর্শন (১৮৭৪), সুলভ সমাচার (১৮৭০), বামাবোধিনী (১৮৬৩) ইত্যাদি। ১৮৬৮ খ্রীঃ যশোর থেকে প্রথম অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ, যিনি দেশ ব্যাপী জনমত গঠনের (ে ত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

সংবাদপত্র প্রকাশের (ে ত্রে অন্যান্য রাজ্যগুলিও পিছিয়ে ছিল না। পশ্চিম ভারতে 'The Rast Goftar', 'The Native Opinion', 'The Indu Prakash', 'the Maratha'. এবং 'The Keshari' বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে ভারতীয় স্বার্থ এবং ব্রিটিশ স্বার্থের মধ্যে মূল দ্বন্দ্বটি তুলে ধরেন। দ(িণ ভারতে 'The Hindu'. 'The Swadesamitra', 'The Andhra Prakashika' এবং 'The Kerala Patrika' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উত্তর প্রদেশে 'The Advocate' 'The Hindustani', 'The Azad' এবং পাঞ্জাবের 'The Tribune', 'The Akbar-i-Am' এবং 'The Koh-i-noor' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রত্যেক সংবাদপত্রেই ব্রিটিশ কূট কৌশলের সমালোচনা করা হয়। উপরিউক্ত(সংবাদপত্রগুলি সমগ্র ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র, শিল্পায়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। যদিও প্রথমদিকের কিছু সংবাদপত্র ইংরেজদের

দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। ত্র(মে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা প্রকাশন মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত(সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হল গণতান্ত্রিক উন্নত সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উপনিবেশতদের কাছ থেকে কোন প্রকার সমালোচনাকেই ব্রিটিশরা প্রশ্রয় দিতে চায়নি। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি যেভাবে জনমত গঠনে সত্রি(য় হয়ে উঠেছিল তাতে জনগণকে সমালোচনার সুযোগ করে দেওয়ার অর্থ (মতা হস্তচ্যুত হওয়া। এই আশঙ্কাতেই ব্রিটিশ সরকার Vernacular Press Act (১৮৭৮) পাশ করে যার দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোর করা হয়। এই আইন পাশের মাধ্যমে দেশীয় মানুষের স্বাধীনতায় হস্তে(প করা হয়েছে এই মর্মে সারা ভারতব্যাপী মানুষ বি(াভে ফেটে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ভাইসরয় লর্ড রিপন 'Vernacular Press Act' বা দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন বাতিল করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় ১৯০৪ এবং ১৯১১ খ্রীঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

১৪.২ গ্রন্থপঞ্জি

১. Bipan Chandra—India's struggle for Independence.

২. Judith Brown—Modern India.

৩. Summit Sarkar—Modern India.

৪. Rajat Kanta Roy—The Felt Community.

১৪.৩ অনুশীলনী

১. পলিটিক্স অফ্ এ্যাসোসিয়েশন 'Politics of Association' বলতে কি বোঝ? জনমত গঠনে এর ভূমিকা আলোচনা কর।

একক ১৫ ❑ উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ—ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক সমালোচনা

গঠন

১৫.০ উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ—ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক সমালোচনা
১৫.১ অর্থনৈতিক সমালোচনা
১৫.২ গ্রন্থপঞ্জি
১৫.৩ অনুশীলনী

১৫.০ উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ—ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক সমালোচনা

পার্সিভ্যাল স্পীয়ারের মতে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের মাধ্যমেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত জয়যাত্রা সূচিত হয়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিভেদ রেখা স্পষ্টতর হতে থাকে। ভারতীয়দের বি(দ্ধে ব্রিটিশরা জাতি বৈষম্যের নীতি নেয়। ইংরেজ শাসকরা এবার 'গাজর ও লাঠি' (Carrot and Stick)-র দ্বৈত নীতি গ্রহণ করে। অন্য কথায় বলতে গেলে অনুমোদন এবং দমনের নীতি গ্রহণ করে। তারা এইরূপ ভাবমূর্তি প্রকাশ করতে চেয়েছিল, যেন তাদের সকল নীতিই জনসাধারণের কল্যানার্থে গৃহীত হয়। তাদের অনুমোদনের নীতি প্রতিফলিত হয় ১৮৬১ তে 'Indian Council Act' পাশের মধ্যে দিয়ে, যার মাধ্যমে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে কিছু মনোনীত ভারতীয়দের নিয়োগ করা হয়, বি(বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শি(ার অগ্রগতি সূচিত হয়, 'Penal Code' বা ভারতীয় দন্ড আইনের প্রচলন করা হয়। তথাপি মহাবিদ্রোহের ফলে মানুষের চেতনা জাগ্রত হয়। এখন থেকে জাতীয়তাবাদী প্রতিত্রি(য়ার (ে ত্রে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী উদ্যোগ নেয়। ফলে ইংরেজ শাসক শ্রেণী সচেতন হয় এবং জাতীয়তাবাদ প্রশমনের তাগিদে 'Divide and Rule' বা ভারতবাসীর মধ্যে ভেদনীতির প্রয়োগ দ্বারা অনৈক্য সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদকে কায়েম করার নীতি নেয়। এই ভেদনীতির ফলেই মহাবিদ্রোহের সময় হিন্দু মুসলিমের দৃঢ় ঐক্যে চিড় ধরে এবং ত্র(মশ সেই চিড় ভাঙণে পরিণত হয়।

১৮৫৭-র বিদ্রোহ আপাত দৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও এই বিদ্রোহের সুদূর প্রসারী ফলস্বরূপ জাতীয় আন্দোলনের (ে ত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। ১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহের মাধ্যমে একটি যুগের অবসান হয় এবং একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। সে যুগ অনুধাবন করে আধুনিকতাকে গ্রহণ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা। এখানেই ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের তাৎপর্য নিহিত। সাভারকর তাই মহাবিদ্রোহকে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্যাদা দিয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ প্রত্য(করেছিল ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের পূর্ণ বিকাশ। সমগ্র বি(ের এক চতুর্থাংশ জুড়ে যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল ইংল্যান্ড ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু। ভারত ছিল তার সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ, যার দ্বারা ইংল্যান্ড সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের এই সম্পূর্ণ তাই ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চেতনার জাগরণ ঘটায়, যে অভিব্যক্তি(র প্রকাশ ঘটে ১৮৮৫ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। বস্তুতঃ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রতিত্রি(য়া স্বরূপই আধুনিক ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব হয়। ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও তার ফলাফলই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রয়োজনীয় ইন্ধন যুগিয়েছিল। এ(ে ত্রে বিপানচন্দ্রের 'Modern India' নামক পুস্তকের একটি মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য যেখানে তিনি বলেছিলেন যে দুই প(ে র স্বার্থের সংঘাতই ছিল এই

সংঘর্ষের মূল কারণ। ব্রিটিশদের ভারত শাসনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করা যার দ্বারা অনেক সময়ই ভারতের মঙ্গল বিসর্জিত হয়েছিল।

পাশ্চাত্য শি(া প্রসারের ফলে, শি(িত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী একধরনের আধুনিক যুক্তি(গ্রাহী জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিকতার অবমাননাকে অনুভব করে। তারা (শো (Rousseau), টমাস পেইন (Thomas Pain), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর লেখার সঙ্গে পরিচিতি হয় এবং ব্যগ্রতার সঙ্গে সমসাময়িক ইওরোপীয় দেশগুলিতে সংঘটিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির সমক(হতে সচেষ্ট হয়। তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিকতার কুফল সম্পর্কিত অবহিতি বিকাশ লাভ করতে থাকে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ শক্তি(শালী আধুনিক ভারতের স্বপ্ন দেখতে থাকে। উল্লেখ্য এ(ে ত্রে রাজভাষা ইংরেজী বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক যোগসূত্রে স্থাপন করে যার ফলে তারা একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি, আকাঙ(া এবং ধারণার অংশীদার হয়। এইভাবেই ইংরেজী শি(া ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার বিকাশে এক গু(ত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়।

১৫.১ অর্থনৈতিক সমালোচনা

গুণগতভাবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ছিল ভিন্ন। এক অত্যুগ্র প্রশাসনের আওতায় ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতি এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয় যার কাঠামো স্থির হয় ব্রিটেনের দ্রুত বিকাশমান শিল্পায়িত অর্থনীতির সঙ্গে সাজুয্য রেখে। ভারতের বাজারকে উন্মুক্ত(করা হয় ব্রিটেনে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রীর জন্য এবং ভারত পরিণত হয় ব্রিটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী আনুষঙ্গীকে। বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। এ(ে ত্রে ভারতের তাঁত বয়ন শিল্প উলজাত বস্ত্র শিল্প, রেশম বস্ত্র শিল্প সর্বাধিক (তিগ্রস্থ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী প্রত্য(করে, ঐতিহ্যিক ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির পতন এবং বাণিজ্যিক পথে একসতেজ অর্থনৈতিক প্রবাহের আগমন যার ফল স্বরূপ ভারতের গ্রামীণ জীবন যাত্রার অবনমন ঘটে। কৃষক ও কারিগরের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, সামগ্রিকভাবে ভারতের বুকে দারিদ্রের করাল ছায়া নেমে আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র ব্যাখ্যার (ে ত্রে উদ্যোগ নেয় এবং বি(ে-ষণের মাধ্যমে তারা শোষণমূলক চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হয়। ফলে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কিত যে হিতবাদী ধারণা তারা পূর্বে পোষণ করত তার অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল উদ্দেশ্য সে ভারতীয় অর্থনীতিকে অবদমন করে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, তাও পরিস্ফূট হয়। দাদাভাই নওরোজী (Poverty and Un-British Rule in India). রমেশচন্দ্র দত্ত (Economic History of India) এবং রাণাডে (Indian Economy) ঔপনিবেশিক শোষণূলক চরিত্রকে প্রকাশ করে ভারতে শক্তি(শালী অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করেন। এই বিষয়টির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন বিপান চন্দ্র তাঁর ''Rise and Growth of Economic Nationalism in India'' নামক গ্রন্থে। দাদাভাই নওরোজী ভারতের দারিদ্র সম্পর্কিত গবেষণায় দেখান কিভাবে ভারত প্রতিদিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছিল। সুতরাং একদিকে ছিল উন্নয়নের আরোহণ আর একদিকে ছিল উন্নয়নের অবনমন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দিকের নেতারা ব্রিটিশ শাসকদের গৃহীত শোষণমূলক অর্থনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এদেশের হস্তশিল্প ধ্বংসের জন্য ব্রিটিশদের দায়ী করে। নওরোজী ভারতের ত্র(মশ দরিদ্র সম্পর্কিত গবেষণায় দেখান কিভাবে ব্রিটিশদের দৌলতে ভারত ত্র(মশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন যে ভারতীয় সম্পদ নির্গমন বন্ধ করা উচিত। ভারতীয়রা শুল্ক সংর(ণের মাধ্যমে ভারতে আধুনিক

শিল্পের বিকাশে পরামর্শ দেন। এবং এই পরিসরে ব্রিটিশ সরকার সাহায্যের মুখাপেী হয়ে থাকেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এদেশীয় কৃষকদের ত্র(মবর্ধমান দারিদ্র সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করে কৃষকদের কল্যাণার্থে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভূমিরাজস্বের হ্রাস সেচকার্যের সুবিধা, কৃষি ব্যাঙ্কের বিকাশ প্রভৃতির দাবী জানায়। সরকারী সেনাবাহিনীর র(ণাবে(ণের জন্য উচ্চ ব্যয় এবং উচ্চ শুল্ককে ভারতের ত্র(মবর্ধন দারিদ্রের জন্য দায়ী করা হয়।

১৫.২ গ্রন্থপঞ্জি

১. Bipan Chandra—India's struggle for Independence.

২. Judith Brown—Modern India.

৩. Summit Sarkar—Modern India.

৪. Dipak Kumar Aich—Emergence of Modern Bengali Elite

৫. Peter Robb—A History of India.

১৫.৩ অনুশীলনী

১. ব্রিটিশ 'অর্থনৈতিক নীতির'র বিরোধিতা (Economic Critique) সম্পর্কে আলোচনা কর।

একক ১৬ ❑ প্রাদেশিক রাজনীতি এবং প্রাক্ কংগ্রেসী যুগ

গঠন

১৬.০ প্রাদেশিক রাজনীতি এবং প্রাক্-কংগ্রেসী যুগ
১৬.১ ইন্ডিয়ান লীগ
১৬.২ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা
১৬.৩ গ্রন্থপঞ্জি
১৬.৪ অনুশীলনী

১৬.০ প্রাদেশিক রাজনীতি এবং প্রাক্-কংগ্রেসী যুগ

১৮৭০ এর দশকে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংগঠন—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক পটভূমি।

যদিও ১৮৩০ এর দশক থেকে আধুনিক রাজনৈতিক সচেতনতার (ে ত্র প্রস্তুত হতে থাকে তথাপি জাতীয়তাবাদী চেতনার সর্বভারতীয় (ে ত্র প্রস্তুত করতে ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন অবধি অপে(া করতে হয়। প্রসঙ্গ তউল্লেখ্য জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কিন্তু বিনামেঘে বজ্রপাত ছিল না। বরং ১৮৩০-র দশক থেকে যে সমস্ত আঞ্চলিক এবং স্থানীয় রাজনৈতিক সমিতিগুলি স্থাপিত হয়েছিল তাদেরই সম্মিলিত রূপ ছিল এই জাতীয় কংগ্রেসের মত সর্বভারতীয় সমিতি। এই সময়কার রাজনীতিকে ডঃ অনিল শীল ''সমিতির রাজনীতি'' (Politics of association) বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন। ভারতে আঞ্চলিক ভাষা ও জাতিভিত্তিক ব্যবধান অতিত্র(ম করে ভারবর্ষকে এক ধর্মনিরপে(, জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে প্রেরণা দেওয়ার জন্যেই এই সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার এই সময় উল্লেখযোগ্য সমিতি ছিল 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এ্যাশোসিয়েশন' (British India Association)। এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূমি স্বার্থ সংর(ণ করা। ফলে এই সমিতিটি শ্রেণী স্বার্থের উর্দ্ধে উঠতে পারেনি। শি(ক, ডাক্ত(ার, উকিল প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত(ব্যক্তি(দের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে 'British India Association' তার গু(ত্ব হারাতে থাকে। প্রথম দিকে এই সমিতি পরিচালনার কাজে ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা। ১৮৫৭ খ্রীঃ-এর মহাবিদ্রোহের পরে কলকাতা বি(বিদ্যালয়ের সাম্মানিক ছাত্ররা এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত(ব্যক্তি(রা এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ১৮৭০-র দশক থেকে কলকাতার নতুন বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে এই সমিতি গু(ত্ব হারায়। কেবলমাত্র ভূমি স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত এই সমিতির প্রাচীনত্ব প্রকাশ পায়। ফলে এই অভাব পূরণের জন্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতি বিকল্প সমিতির উদয় হয়।

১৬.১ ইন্ডিয়ান লীগ

অস্তিত্বশীল সমিতিগুলি যখন কলিকাতার উদীয়মান বুদ্ধিজীবীদের নতুন জাগরিত রাজনৈতিক আকাঙ(াকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি তখন বিকল্প সমিতির জন্ম হয়। ১৮৭৫ সালে শিশির কুমার ঘোষ ইন্ডিয়ান লীগ স্থাপন করেন। এই সমিতির নেতা দাবী করেন যে এটি ছিল প্রথম সর্বভারতীয় সমিতি। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী। কিন্তু ইন্ডিয়ান লীগ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। শিশির কুমারের নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে লীগ দুর্বল হয়ে পড়ে। শীঘ্রই ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন লীগের স্থান দখল করে।

১৮৭৬ খ্রীঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এবং অন্যান্যদের দ্বারা ইন্ডিয়ান এ্যসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের স্থাপন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে একটি নতুন যুগের সূচনা করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ছিলেন এই সমিতির মুখ্য ব্যক্তি। তিনি ১৮৬৯ খ্রীঃ আই. সি. এস পাশ করেন এবং চাকুরীতে যোগ দেন। কিন্তু ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মীরা সুরেন্দ্রনাথের মত প্রতিভাধর ব্যক্তিকে সহকর্মী হিসেবে বরদাস্ত করতে না পারায় ১৮৭৪ খ্রীঃ তিনি চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হন। বিভিন্ন বিষয়ে এই সমিতি আবেদন, প্রচার ও আন্দোলন গঠন করে। **প্রথমতঃ,** এদেশে একটি শক্তিশালী জনমত গঠন। **দ্বিতীয়তঃ,** সকল ভারতীয়ের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার ঐক্যকরণ, **তৃতীয়তঃ,** হিন্দু মুসলমান ঐক্যের অগ্রগতি। **চতুর্থতঃ,** বৃহত্তর জনস্বার্থে জনগণকে পরিচালিত করা।

এই সমিতির কর্মকর্তারা, হিন্দু প্যাট্রিয়টের (Hindu Patriot) প্রশংসাসূচক বাক্য অনুযায়ী ছিলেন সুশিক্ষিত ভারতীয় যুবকগণ। এই সমিতির ২৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১০ জন ছিলেন কলিকাতার গ্র্যাজুয়েট, ১ জন কেমব্রিজ গ্র্যাজুয়েট, দুজন কর্মকর্তা সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন। সুরেন্দ্রনাথ যদিও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন কিন্তু নগণ্য কারণে তাকে পদচ্যুত করা হয়। কর্মকর্তাদের মধ্যে ৫ জন ছিলেন সংবাদপত্রের সম্পাদক। এছাড়া ছিলেন প্রচুর শিক্ষক ও আইনজীবী। এই সংস্থা মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয়। ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন-এর গঠনতন্ত্র ছিল গণতান্ত্রিক। এই সমিতির বহু শাখা মফঃস্বলের মহলে বিস্তৃত হয়। **Indian Civil Service', 'The Arms Act', "The Vernacular Press Act', 'Ilbert Bill'** প্রভৃতির বিরুদ্ধে Indian Association জনমত গঠন করতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

১৮৭৬ সালে আই. সি. এস পরীক্ষার্থীর বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯এ ধার্য করলে ভারতীয়দের চাকুরীতে প্রবেশের সুযোগ কঠিন হয়ে যায়। ভারতীয়রা বুঝতে পারে ব্রিটিশরা কোন মতেই উচ্চপদের একচেটিয়া অধিকার ছাড়তে চায় না। এই বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী সভার আয়োজন করা হয় টাউন হলে। এই সভাকে অনুসরণ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীঃ এর মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করেন। এই প্রথম জাতীয় স্তর থেকে কোন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। প্রতিটি অঞ্চলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদের নতুন উদ্যমকে জাগিয়ে তোলেন। ফলে সারা দেশজুড়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়। ইংল্যান্ডের House of Commons এ একটি সর্বভারতীয় স্মারক পাঠানো হয় সিভিল সার্ভিস আইন বিষয়ক। ১৮৭৯ খ্রীঃ ইংল্যান্ডে লালমোহন ঘোষকে পাঠানো হয় সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধীয় তদারকির জন্য। পরবর্তীকালে আই.সি. এস. পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে সরকার পুর্নবিবেচনা করেন এবং ভারতীয়দের কিছু দাবীকে সেক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়।

১৮৭৮ খ্রীঃ লর্ড লিটনের দমনমূলক আইনগুলি—Arms Act বা অস্ত্র আইন, Vernacular Press Act বা দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন পাশ করা হয়। অস্ত্র আইনের মাধ্যমে বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার নিষেধাজ্ঞা জারীর মাধ্যমে ভারতকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র দমন আইন সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। উপরিউক্ত দুটি আইনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতীয়রা প্রতিবাদ জানায়। ইন্ডিয়ান এশোসিয়েশনকে সামনে রেখে সুরেন্দ্রনাথ সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এছাড়া আফগানদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ব্যয়বহুল সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিণামে ভারত থেকে প্রচুর অর্থ নির্গত হয়। ফলে ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশনের সদস্যরা আন্দোলনমুখী হন। ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশনের নির্দেশে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে একটি আবেদনের খসড়া রচনা করেন যা ব্রিটিশ আইন সভায় পাঠানো হয়। উল্লেখ্য ১৮৮১ খ্রীঃ দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র দমন আইন বাতিল করা হয়।

ইলবার্ট বিল আন্দোলন নিয়ে ১৮৮৩ খ্রীঃ ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৮৬৩

খ্রীঃ ফৌজদারী আইন বিধি অনুসারে কোন শ্বেতাঙ্গ আসামী ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হলে একমাত্র শ্বেতাঙ্গ বিচারক বা জজরাই তাদের মামলার বিচার করতে পারতেন। কোন দেশীয় বিচারক শ্বেতাঙ্গ আসামীকে ফৌজদারী মামলায় বিচার করতে পারতেন না। বলাবাহুল্য যে এই প্রথা ছিল ভয়ানক বৈষম্যমূলক এবং জাতিবৈরিতা সূচক। লর্ড রিপনের আমলে অনেক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ দেশীয় কর্মচারী কভেন্যান্টেড সার্ভিসের ফলে বিচার বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র গাত্র বর্ণের জন্যে তারা শ্বেতাঙ্গ আসামীর মামলার বিচার করতে পারতেন না। মফঃস্বলে ইংরেজ জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা বেশী ছিল না। ফলে চা বাগিচা বা নীলকর সাহেবরা দেশীয় লোকেদের মারধর করলেও মফঃস্বলে উপযুক্ত বিচার না থাকায় শাস্তি পেত না। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটরা সাধারণত অপরাধীদের লঘুদণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিতেন। বিহারীলাল গুপ্ত তখন কলকাতায় প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি এই বৈষম্য মূলক আইনের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লর্ড রিপন এই ব্যবস্থার বৈষম্য ও অন্যায় উপলব্ধি করে তাঁর আইন সচিব কোটনী ইলবার্টকে একটি বিল তৈরীর আদেশ দেন। তাঁর নামেই বিলটি ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত হয়। এই বিলে ভারতীয় বিচারকদের শ্বেতাঙ্গ আসামী ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হলে তার বিচারের অধিকার দেওয়া হয়। ইওরোপীয় সম্প্রদায় এজন্য ক্ষিপ্ত হয়ে বিলটির তীব্র বিরোধিতা করে। সুরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় ইন্ডিয়ান এশোসিয়েশন ইলবার্ট বিলের সমর্থনে জনসভা ও সংবাদপত্রে মতামত জানাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত লর্ড রিপন ইংরেজ প্রতিবাদের চাপে বিলটি সংশোধন করেন। ইলবার্ট বিল আন্দোলন উপলক্ষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তীব্র হয়। ইংরেজদের মতই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন (১৮৮৩-র ডিসেম্বর) বা ন্যাশনাল কনফারেন্স আহ্বান করে। এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ কারীরা প্রযুক্তি বিদ্যা, সিভিল সার্ভিসের বিধি নিয়ম, অস্ত্র আইন, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ বম্বেতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সময় দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। বলাই বাহুল্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, সুরেন্দ্রনাথের সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।

অন্যান্য সমিতি ঃ ১৮৫৮ র পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ইংরেজ সরকারের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশই প্রসারিত হতে থাক। পূর্বের সংঘ সমিতিগুলি তৎকালীন ভারতীয়দের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে না পারায় নতুন সভাসমিতির প্রয়োজন দেখা দিল। দাদাভাই নওরোজী ১৮৬৯ খ্রীঃ লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিটিশ জনমত গড়ে তোলার জন্য। ১৮৭১ খ্রীঃ তিনি বম্বেতে উপরিউক্ত সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৭ তে গোপাল পুরি দেশমুখ, রানাডে এবং অন্যান্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় পুণা সার্বজনিক সভা। ১৮৮৪ সালে মাদ্রাজ মহাজন সভা তার কার্য শুরু করে, ১৮৮৫ তে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়।

এইভাবে সভাসমিতি তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়। এই সময়টি ছিল ভারতীয় যুবকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের যুগ। যা ভারতীয় কংগ্রেসের অগ্রগতির পথকে প্রসারিত করে। ১৮৮৫ খ্রীঃ উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী সভাপতিত্বে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৭২ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে প্রতিনিধিরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে আনুগত্য জানায় এই মর্মে যে এদেশে ব্রিটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা আরও প্রসারিত করা হোক যেখানে ভারতীয়রাও অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে নয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রারম্ভ এতটাই দুর্বল ছিল যে পুর্নস্বরাজের দাবী করতে প্রায় ৪৪ বৎসর লেগে গেছিল। প্রত্যেক বৎসরের শেষে কংগ্রেসের অধিবেশন বসত। এই অধিবেশন চলত ৩দিন ধরে। পরবর্তীকালে এই অধিবেশন সম্মেলনের মত একটি সামাজিক উৎসবেও পরিণত হয়। প্রথম দিকে কংগ্রেসের যোগদানকারীরা ছিলেন প্রধানত আইনজীবী, সাংবাদিক, শিল্পপতি, শিক্ষক, ভূস্বামী প্রভৃতি জীবিকাধারীগণ এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে

সফল। এরা ব্রিটিশ সংস্কৃতি, সভ্যতা এমনকি শাসনের প্রতি অনুরক্ত(ছিলেন। ফলে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল অবধি কংগ্রেসের কার্যাবলী বিপ-বাত্মক ছিল না। কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দু দশকের কার্যাবলীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল নরমপন্থী। অবশ্য কংগ্রেসের প্রাথমিক পর্বের চরিত্র নরমপন্থী ছিল কিনা তা বিতর্কের বিষয়। তবে প্রথম দিককার কংগ্রেসীরা যে রাজনৈতিক কার্যকলাপকে আদর্শ মনে করেছিলেন তার প্রকৃতিই সম্ভবত এই বিশেষণের জন্য দায়ী। তারা মনে করতেন তাদের প্রধান কর্তব্য জনসাধারণকে আধুনিক রাজনৈতিক শি(া প্রদান করা। তাদের অধিবেশনে জনসাধারণের দাবীদাওয়াকে বি(-ষণ করে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হত। তারা প্রচুর স্মারক এবং দাবী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে পাঠিয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দিকের কয়েকজন বিখ্যাত নেতারা হলেন দাদাভাই নওরোজী, বদ(দ্দিন্ তায়েবজি ফিরোজশাহ মেহেতা, পি আনন্দ চালু, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আনন্দ মোহন বসু, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, বাল গঙ্গাধর তিলক, মদন মোহন মালব্য এবং জি সুব্রমণিয়াম আইয়ার।

সভাসমিতির রাজনীতির মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়, যার দ্বারা সকল ভারতীয়দের রাজনৈতিক আকাঙ(াকে কাঠামো প্রদান করা যাবে। এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। Indian Association এবং British Indian Association এর মধ্যে যে সীমাবদ্ধগুলি ছিল তাকে অতিত্র(ম করা প্রয়োজন ছিল, তার সঙ্গে প্রাদেশিকতার গন্ডি অতিত্র(ম করাও প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনকে ফলপ্রসু করার জন্য অনেক পদ(প গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের পরিকল্পনাই ফলপ্রসূ হয়। লিটনের শাসনকালে তিনি ভারত সরকারের উচ্চ সচিবের পদে নিযুক্ত(ছিলেন। তিনি ভারতীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রাণিত করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন ডাকার জন্য যা, ১৮৮৫ খ্রীঃ এ বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের এই অধিবশেনে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৭২ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী।

১৬.২ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৮৮৫ খ্রীঃ এর ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পরবর্তী দশকগুলিতে ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলন এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নানামত, নানা বিতর্ক আছে। হিউমের জীবনীকার ওয়েডারবানের মতে ''ভারতে সেই সময় ব্রিটিশ নীতির প্রতিত্রি(য়া হিসেবে যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় তা নিরাপদে বর্হিগত করার জন্য একটি সেফটি ভালভ বা নিরাপদ কপাটের প্রয়োজন ছিল'' যা হিউম অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে জানা দরকার হিউম ছিলেন র‍্যাডিক্যাল ইংরেজ নেতা যোসেফ হিউমের পুত্র। জন্মসূত্রে তিনি পিতার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক ছিলেন। তিনি ইওরোপীয় বৈপ-বিক সভা সমিতিগুলোর সঙ্গে যুক্ত(ছিলেন। কিন্তু একজন অবসর প্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী হিউম কেন ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন? সেফটি ভাল্ভ মতবাদের সমর্থকরা বলেন তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের আদেশ পালন করাই ছিল হিউমের প্রাথমিক কর্তব্য ও উদ্দেশ্য। সিমলায় ১৮৮৫ খ্রী-র মে মাসে বড়লাট লর্ড ডাফরিন ও হিউমের মধ্যে সা(াৎকারের সময় ডাফরিন মন্তব্য করেন ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে বিরোধী দল সরকারের দোষ ত্রুটির সমালোচনা করায় সরকারের সুবিধে হয়। সুতরাং ভারতেও এইরূপ একটি সমিতিকে সমালোচনার অধিকার দিলে এই সমিতি সরকারের বি(দ্ধ প(ের ভূমিকা গ্রহণ করবে। শি(িত মধ্যবিত্তরা সরকারের কাজকর্মের সমালোচনার অধিকার পেলে সেফটি ভাল্ভের কাজ করবে। হিউম ডাফরিনের

পরামর্শ গ্রহণ করে পুণায় 'Indian Union' এর অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। পুণায় কলেরা দেখা দিলে অধিবেশন বোম্বাইয়ে করা হয় এবং এই সমিতির নাম রাখা হয় Indian National Congress বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

উপরিউক্ত বিবরণের উপর নির্ভর করে মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্ত একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে লর্ড ডাফরিন প্রাক্তনে সিভিলিয়ান হিউমের সাহায্যে ভারতীয়দের অসন্তোষকে দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে একটি সেফটি ভাল্‌ভ হিসেবে ব্যবহার করেন। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা আনুগত্য পরায়ণ ছিল তাদের, চরমপন্থীদের থেকে দূরে রাখা। তাদের ধরে রাখার জন্যেই লর্ড ডাফরিন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করেন। এই তথ্য সত্যি যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। তথাপি সেফটি ভাল্‌ভের মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেসের উত্থানকে বিপানচন্দর উপকথা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন—**প্রথমতঃ,** ১৮৭৮ সালে হিউম ছিলেন রাজস্ব বিভাগ, কৃষি বিভাগ, বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মসচিব। সুতরাং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দলিল তার হস্তগত হওয়া সম্ভব নয়। **দ্বিতীয়তঃ,** হিউমের জীবনীকার ওয়েভাবান যে সাতখন্ড গোপন রিপোর্টের কথা বলেছেন—যার ফলে হিউম আসন্ন বিদ্রোহের সম্ভাবনায় চঞ্চল হন। বিপানচন্দ্র এই মত স্বীকার করেন না। কারণ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দলিল কেবলমাত্র দিল্লীতেই লভ্য ছিল। **তৃতীয়তঃ,** হিউম সাত খন্ড গোপন রিপোর্ট ১৮৭৮ খ্রীঃ-এ পড়েন এবং আসন্ন বিদ্রোহের সমভাবনায় চঞ্চল হন। যদি তাই হয়, তাহলে কোন অর্থে এই বিদ্রোহ প্রশমনের তাগিদে ১৮৮৫ খ্রীঃ অবধি অপেক্ষা করতে হল। **চতুর্থতঃ,** কিভাবে একটি দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন ১৮৮৫ খ্রীঃ এ বিভিন্ন প্রদেশের কেবলমাত্র ৭২ জন প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত সমিতির মাধ্যমে স্তিমিত হয়ে গেল? **পঞ্চমতঃ,** কংগ্রেস যদি হিউমের মস্তিষ্ক প্রসূত চমৎকারিত্ব হত তাহলে ১৮৮৮ খ্রীঃ হিউম কংগ্রেসকে আক্রমণ করতেন না। **ষষ্ঠতঃ,** সেফটি ভালভ্ নীতি প্রচার করতে গিয়ে হিউমের জীবনীকার ওয়েডারবার্ন যে সাতখন্ড গোপন রিপোর্টের কথা বলেছেন তা ১৯৫০-র দশকে ঐতিহাসিকদের গবেষণায় নিয়োজিত করা ছাড়া আর কোন ফল দেয়নি।

বিভিন্ন শক্তির আন্তঃ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। ফলে কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির অবদানকে প্রাধান্য দিলে তা অবিচার্যতায় পরিণত হবে। তবে যা উল্লেখের অবকাশ রাখে তা হল—তৎকালীন প্রেক্ষিতে সারা ভারতব্যাপী একটি জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। যেসকল ভারতীয়রা হিউমকে সহযোগিতা করেছিলেন তারা ছিলেন উচ্চ দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ। তারা স্বেচ্ছায় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের ক্ষেত্রে হিউমের সাহায্য গ্রহণ করেছিল এবং সম্ভবত এই কারণেই ব্রিটিশ বিরোধিতা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। হয়ত হিউমও কেবলমাত্র সেফটি ভালভ্ নীতির থেকেও উচ্চ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। কারণ যোসেফ হিউমের পুত্র হওয়ার সুবাদে দুর্বলের প্রতি অনুরক্তি তা তার জন্মসূত্রে পাওয়া গুণ। ফলে দুর্বল ভারতীয়দের জন্য কিছু করার বাসনা তার ছিলই। আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকেও ভারতীয় রাজনীতিতে হিউমের আগ্রহের কারণকে বর্ণনা করতে পারি। সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন—তৎকালীন ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিলই এবং এই পূর্বরচিত পটভূমিকাই কৌশলগতভাবে হিউম গ্রহণ করেন। আসলে হিউম উদ্যোগ গ্রহণ করলেও প্রকৃত পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রীঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর (All India National Conference) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে। উল্লেখ্য এই প্রতিষ্ঠানটিই ১৮৮৬ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

১৬.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১. Bipan Chandra—India's struggle for Independence.

২. Judith Brown—Modern India.

৩. Summit Sarkar—Modern India.

৪. Dipak Kumar Aich—Emergence of Modern Bengali Elite

৫. Peter Robb—A History of India.

১৬.৪ অনুশীলনী

১. জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুত্থানের পিছনে রাজনৈতিক প্রে(াপট লেখ।